পুনর্ভব

সুবোধ বসু

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-২৯

শ্রীফণিভূষণ সেনগুপ্ত
শ্রীবিজয়েশ মুখোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

সুবোধ বসু-র
অন্যান্য বই

উপন্যাস

পদ্মা প্রমত্তা নদী
নব মেঘদূত
রাজধানী
পাখির বাসা
মানবের শত্রু নারী
চিমনি
পদধ্বনি
স্বর্গ
সহচরী
ইঙ্গিত
নটী
স্ত্রীযুদ্ধ
ঊর্দ্ধগামী
বন্দিনী

গল্প সংগ্রহ

জয়যাত্রা
বিগত বসন্ত

নাটক

অতিথি
কলেবর
তৃতীয় পক্ষ

কিশোর সাহিত্য

পদ্মা নদীর ডাক
বুদ্ধির্যস্য

পুনর্ভব

এক

বিকাল চারটে। এই মাত্র কালীঘাট রোডের হরিসভা হাইস্কুলের ধরা-গলা ঘণ্টায় ছুটির পিটুনি পড়িয়াছে। এখনও ফটকের মুখে ইহার ফলাফল আত্মপ্রকাশ করে নাই, কিন্তু আর দেরিও নাই। কয়েদ-ভোগের পর মুক্তি-পাওয়া কয়েদীদের মুখে যতটা আনন্দ প্রকাশ পাওয়ার কথা তার শত গুণ আনন্দ লইয়া স্কুলের ছোটো ছোটো প্রাত্যহিক কয়েদীরা এখনই বই-বগলে সহাস্য ও গুঞ্জনরত মুখে দলে দলে বাহির হইয়া আসিবে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এখানকার সারা আব্‌হাওয়াই বদলাইয়া যাইবে।

রাস্তা চওড়া নয়। ফুটপাথ নাই। স্কুলের ফটকের প্রায় গা ঘেষিয়া আইসক্রিম-অলার চলন্ত গাড়ি, চানাচুর-অলার প্যাকেটের ধামা এবং খাবার-অলার কাচের বাক্স মক্কেল পাকড়াইবার দুরন্ত আগ্রহে প্রলোভন উদ্যত করিয়া রাখিয়াছে। স্কুলের ছুটির সময় বিক্রির একটা ভালো মর্শুম। এ সময়টায় হকারেরা আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করে।

ইহাদের চেয়ে আরও অনেক বেশি আগ্রহ সহকারে কিন্তু আর একজন অপেক্ষা করিতেছিল। হলদে রঙের প্রকাণ্ড বুইক গাড়িটা স্কুল-ফটকের অনতিদূরে রাস্তার উল্টা দিকে গত আধ ঘণ্টার উপরে নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। আশে-পাশের কৌতূহলী দোকানীরা গত কিছুদিন হইতেই গাড়িটিকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে। অতি সম্ভ্রান্তদর্শনা একজন মহিলা এই গাড়ির পিছনের আসন হইতে স্কুলের ফটকের দিকে

অতি ব্যগ্রভাবে চাহিয়া থাকেন, ইহাও কেহ কেহ লক্ষ্য করিয়াছে। সিদ্ধান্ত করিয়াছে, স্কুলে বাড়ির ছেলেপিলে কেউ পড়ে।

আজও গাড়িটি এবং গাড়ির আরোহিণী যথাস্থানে উপস্থিত, উপরন্তু একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোকও মহিলার পাশে উপবিষ্ট আছেন। এইবার পাড়ার গেজেট বুড়া ভবশঙ্করখুড়ো গাড়ির মালিককে সনাক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। হার্মোনিয়ম মেরামতের দোকানের ভাঙা টুলে আসীন হইয়া দোকানের মালিকের কাছ হইতে একটা বিড়ি চাহিয়া লইয়া তিনি কহিলেন: 'আরে, এ যে পদ্মপুকুরের রায়বাহাদুর প্রতাপ মুখুজ্জে! মস্ত ধনী লোক। এঁর একমাত্র ছেলে গতবারে মারা গেল না? কাগজে বেরিয়েছিল। ইস্কুলে আবার কে পড়ছে?' ভবশঙ্কর খুড়ো অনেক খবর রাখেন বটে, তবে অজস্র রাজা-উজিরও মারেন। কৌতূহলীরা এই খবর সমর্থনের জন্য মোটরগাড়ির উদ্দিপরা শোফেয়ারকে একা পাইবার সুযোগের অপেক্ষায় রহিল।

স্কুলের কোলাহল-মুখর ফটকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া গাড়ির আরোহিণী স্বামীকে কহিলেন, 'দেখ, দেখ। ঠিক সেই রকম মুখ, ঠিক সেই রকম চাউনি, ঠিক সেই রকম শক্ত করে' ঠোঁট বুজে দাঁড়াবার ভঙ্গি···'

রায়বাহাদুর প্রতাপ মুখুজ্জে আগের মতোই নীরব রহিলেন। ইতিপূর্ব্বে আরও একাধিক দিন তাঁকে আসিতে হইয়াছে, দেখিতে হইয়াছে এবং স্ত্রী রাণীদেবীর কাছ হইতে এই একই উক্তি শুনিতে হইয়াছে।

বেচারি রাণী! রায় বাহাদুর সহানুভূতির সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণ করেন। চিতার আগুনে যে পুত্রের দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে তাহার অবসানও সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। ছেলে বলিয়া কাহাকেও সে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়।

একদিন কালীঘাটের মন্দিরে পূজা সারিয়া রাণীদেবী মোটরে এই পথে বাড়ি ফিরিতেছিলেন। স্কুলের টিফিনের ছুটি হইয়াছে। ছেলেরা রাস্তায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই ভিড়ের দরুণ গাড়ির গতি কমাইতে হইয়াছিল। তখনই হঠাৎ ছেলেটি রাণীদেবীর নজরে পড়ে। তিনি চমকাইয়া ওঠেন। এই অজ্ঞাতনামা জীর্ণবেশ বালকের মধ্যে তিনি তার মৃত ছেলে শঙ্করের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন।

তারপর হইতে এই মোহ তাকে পাইয়া বসিয়াছে। প্রত্যহ স্কুল-ছুটির সময় এখানে গাড়ি লইয়া আসিয়া অপেক্ষা করেন; একাধিক দিন স্বামীকে এখানে টানিয়া আনিয়া ছেলেটিকে দেখাইয়াছেন।

সাদৃশ্য যে কিছুটা নাই, তা নয়। কিন্তু রায়বাহাদুরের কাছে তা এমন কোনও বড় কথা হইত না, যদি না ইহা তাহার শোকসন্তপ্তা স্ত্রীর কাছে মস্ত বড় রকম সান্ত্বনা হইয়া দেখা না দিত। স্ত্রীর সান্ত্বনা হিসাবে তিনিও এ খেলায় একটা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

'বাছারে, মরে যাই! কি ছেঁড়া জামা-কাপড়ই পরে' আছে! একটু সাফ্ করে' দেবারও কি কেউ নেই!' চোখের দৃষ্টি একই লক্ষ্যের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া রাণীদেবী যেন স্বগতোক্তি করিলেন। 'নোংরা জামাকাপড়ে তার কি ঘেন্নাই ছিল!...ওমা, কি খাচ্ছে দেখো না। এই মিষ্টিও কেউ কিনে খায়। অসুখ করবে যে! রঘুনন্দন যাক্ না, এইবার ওকে ডেকে নিয়ে আসুক। তাড়াতাড়ি না করলে এগুলিই যে খেয়ে বসবে...'

রায়বাহাদুর একবার শোফেয়ার রঘুনন্দনকে সম্বোধন করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। স্কুলের ফটকের সামনে তখনও ছেলেদের ভিড়। এই ভিড়ের সামনে কোনও দৃশ্যের অবতারণা না হয়, সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। তাহার প্রকাণ্ড ও চক্‌চকে

গাড়ি হইতে উর্দ্দি-পরা চালক নামিয়া গিয়া যদি খামখা এই জীর্ণবেশ বালককে সম্বোধন করে ও মোটরের কাছে ডাকিয়া আনিবার চেষ্টা করে, তবে বিস্মিত বালকের এবং তাহার কৌতূহলী সতীর্থদের মধ্যে যে আলোড়নের সৃষ্টি হইবে, তাহা কম বিপজ্জনক নয়।

তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, 'এখন নয়, আর একটু পরে···'

রাণীর কানে হয়তো ইহা প্রবেশই করিল না। তিনি অপলকদৃষ্টিতে ছেলেটির প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

বছর পনেরোর রোগা, উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ ছেলেটি। লম্বাটে ধরণের কচি মুখে টিকলো নাক ও ঠোঁট বুজিবার বিশেষ ধরণটি লক্ষ্যণীয়। চোখ দুটি টানা এবং দৃষ্টি স্বচ্ছ। এ বয়সের ছেলের পক্ষে একটু বেশি গম্ভীর। জামা-কাপড়ে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। এই গাম্ভীর্য্য দরিদ্রের আত্মরক্ষার বর্ম্ম হওয়া অসম্ভব নয়।

অধিকাংশ ছেলে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িবার পর তবেই ছেলেটি ফটকের মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। হাঁটিবার গতিটাও তার অন্যান্যদের চেয়ে কিছুটা মন্দ। তার কয়েকটি সহপাঠী পিছন হইতে আসিয়া, তার কাঁধে ভর দিয়া দুই চারটা লাফ দিয়া বেশ কয়েক সেকেণ্ড আগেই গিয়া আইসক্রীমের গাড়ির সামনে হাজির হইয়াছে। ইহাতেও ছেলেটি উৎসাহিত বোধ করে নাই।

রাস্তায় নামিয়া দু'চারবার সে কাছাকাছির চিত্তলোভা জিনিষগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু ইহাদের আকর্ষণে আত্মসমর্পণ করিবে না, আগে হইতেই যেন ইহা ঠিক আছে। রসা রোডের দিকে দু'চার পা সে আগাইয়া গেল। বড় ক্ষিদে পাইয়াছে। পকেটের পয়সা চারটি ব্যয় করিয়া ফেলিবে কি? আবার চার পা পিছন হাঁটিয়া সে ইস্কুলের ফটকের কাছে হাজির হইল।

ইতিমধ্যে খদ্দেরের ভিড় অনেকটা কমিয়াছে। সহজেই খাদ্যদ্রব্য-গুলির কাছে আগান যায়।

'পান্‌তোগুলি কত করে?' একটু সভয় কণ্ঠ। খাবারঅলা ছ-আনা চাহিয়া না বসে, যা বড় দেখিতে।

'চার পয়সা।'

'আর শোন্‌পাপড়ি?'

'তাও এক আনা। কটা দেব?'

পরিমাণ ঠিকই ছিল, কিন্তু বাধা আসিল অন্য দিক হইতে। একটা বুড়ী ভিক্ষুক সময় বুঝিয়া পিছন হইতে হাজির হইয়াছে। ইহার কাতরোক্তিতে ছেলেটি চমকাইয়া পিছন ফিরিয়া চাহিল।

'দু'দিন খাওয়া হয়নি, বাবা। গরিবকে একটা পয়সা দিয়ে যাও, বাবা···ক্ষিদের জ্বালায় মরে গেলাম, বাবা···'

'শোন্‌পাপড়ি দেব, না পান্‌তো?···'

'আজ থাক। আজ আর পয়সা নেই।' তেলোর উপরে মেলা পয়সা চারটির মধ্য হইতে দুটি পয়সা বুড়ী ভিখারিণীকে দিয়া ছেলেটি প্রায় অপরাধীর কণ্ঠে কহিল।

মিষ্টিঅলার মুখমণ্ডল বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে, এটা কম ভয়ের কথা নয়।

কিন্তু যেটা মিঠাই-অলার ক্ষতি, সেটা চানাচুর-অলার লাভ। ছেলেটি এবার চানাচুর-অলার কাছে আগাইয়া গেল, এবং এক পয়সায় এক ঠোঙা চানাচুর কিনিয়া একটি পয়সা আবার পকেটে ভরিয়া রাখিল। ইতিমধ্যে ঠোঙার মুখ খোলা হইয়াছে। মহা তৃপ্তিসহকারে চানাচুর চিবাইতে চিবাইতে রসা রোডের দিকে পা চালানো শুরু হইল।

'শুনচ, খোখাবাবু!'

ছেলেটি চমকাইয়া পিছনে তাকাইল। বড়ো লোকের মোটর গাড়িতে যাত্রার রাজাদের মতো লম্বা পোশাকপরা যেমন ড্রাইভার থাকে, ঠিক তাদেরই মতো লম্বা জামা ও পাগ্‌ড়ি-পরা একটা লোক তাহার একেবারে পাশে আসিয়া হাজির হইয়াছে।

'কি বলচ? আমাকে বলচ?'

'হা, জী। মাইজী তোমাকে বোলাচ্ছেন, গাড়িতে বোসে আছেন।...'

বিস্ময় ও অপ্রত্যয়ের অনেকগুলি রেখা ছেলেটার মুখের উপর জাগিয়া উঠিল। ছেলেধরা নয়তো? ছেলেধরারা এমনি করিয়াই নাকি ছেলেদের ভুলাইয়া থাকে।

'না, আমি যাব না।'

'আরে, ঘাব্‌ড়াচ্ছো কেনো, খোখাবাবু। দেখচো না, গাড়ীর খিড়কী দিয়ে মাইজী তোমাকে দেখচেন।...''

এইবার ছেলেটি এই ব্যক্তির দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া প্রকাণ্ড মোটর গাড়িটা ও তাহার জানালার কাছে একজন অতিশয় সম্ভ্রান্তদর্শন ভদ্রমহিলাকে আবিষ্কার করিল। এইবার সে স্থির-নিশ্চয় হইয়া পার্শ্ববর্তীকে কহিল, ''দূর, আমাকে নয়।'

'হা, জী খোখাবাবু। তুমি নিজে এসে পুছ করে' যাও।'

ছেলেটি ক্ষণকাল দ্বিধা করিল। একটু লোভ হইল না, এমন নয়। এতবড় একটা গাড়ির অধিরোহিণীর সঙ্গে যদি দু'চারটা কথাও বলিয়া আসিতে পারে, তাই বা মন্দ কি। উনি নিশ্চয়ই ছেলেধরা নন। ছেলেধরা সে কখনও দেখে নাই; তবু ছেলেধরা দেখিলে সে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে! সে যাওয়াই সিদ্ধান্ত করিল।

'তুমি কোথা থাক, বাবা ?'

'আমি! আর একটু দূরে। বেলতলায় তিন নম্বর বস্তিতে আমার···''

'কি নাম তোমার, বাবা ?'

''তপন মুখুজ্জে।'

'মুখুজ্জে!' রাণীদেবী চম্‌কাইয়া উঠিয়া স্বামীর দিকে চাহিলেন, এবং দৃষ্টি আবার বালকের প্রতি ন্যস্ত করিয়া কহিলেন, 'চলনা, বাবা, তোমাদের বাড়িটা একটু দেখে আসি। এস, গাড়িতে উঠে এস। কিচ্ছু ভয় নেই তোমার···'

উঠিবে কি ? এ কি রকম অদ্ভুত আচরণ! তাহার বাড়ি দেখিয়া ইহার লাভ কি ? এ তো ছেলেধরার নতুন কৌশল নয় ?

ইতমধ্যে শোফেয়ার গাড়ির দরজা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাণীদেবী নিজেই বালকের হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, 'এসো, বাবা। কিছু তোমার ভয় নেই। আমি কি তোমার মন্দ করতে পারি···'

ইহার কথায় যতটা আশ্বস্ত না হোক, সঙ্কোচে পড়িয়া বালক ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

'সিধে যাবে তো ?'

'হাঁ।'

'সিধা চালাও, রঘুনন্দন। কোন্ দিকে যেতে হবে তুমিই বলে দিও, বাবা।'

তপন দোলায়মান গদিতে জড়সড় হইয়া বসিয়া রহিল। রাণীদেবী বারম্বার তার মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন, সস্নেহ দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

'বাড়িতে তোমার কে আছে, বাবা ?'

'দাদু আছেন।' তপন কহিল।

'মা বাবা, ভাই বোন···'

'আর আমার কেউ নেই।" গলার স্বর এবার আর্দ্র।

আবার রাণীদেবী স্বামীর সাথে দৃষ্টিপাত করলেন।

'তোমার দাদুর নামটি কি বাবা, তপন ? তিনি কি করেন ?'

'ভবনাথ দাস। ষ্ট্যাম্প ভেণ্ডার।'

এইবার রায়বাহাদুরই জেরা করিলেন। স্নেহার্দ্র কণ্ঠেই তিনি কহিলেন, 'দাস ! তবে যে তোমার নাম তপন মুখুজ্জে বললে ?···'

তপন মুখ তুলিল না। কিন্তু অবিলম্বেই প্রশ্নের জবাব দিল। কহিল, 'ইনি আমার আপন দাদু নন। আমাকে পেলেচেন···না, না, ডান দিকে নয়। বাঁ দিকে। আর একটু এগুলেই তিন নম্বর বস্তি...'

রঘুনন্দনের গাড়ির দিক দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইল। রাণী দেবী স্বামীর কানের কাছে মুখ লইয়া মৃদুকণ্ঠে কি কহিলেন, তাহা তপনের কানে প্রবেশ করিল না। কিন্তু গাড়িটা যে তাহার প্রদর্শিত পথেই চলিতেছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া সে আশ্বস্ত বোধ করিল। তবে সত্যই সে ছেলেধরার হাতে পড়ে নাই।

'ব্যস, ব্যস, এইবার থাম।'

এবারও তাহার নির্দ্দেশের সম্মান করা হইল।

গাড়ি হইতে সগর্ব্বে নিচে নামিয়া সে বলিল, 'এই গলিটা দেখচেন না, এর একদম শেষের বাড়িটায় আমরা থাকি···'

'তোমার দাদুকে এখন বাড়ি পাওয়া যাবে, তপন ?' রায়বাহাদুর প্রশ্ন করলেন।

'দাতুর বাড়ি ফিরতে রোজ সন্ধ্যে হয়ে যায়।' তপন কহিল।

'তবে এখন থাক।' রায়বাহাদুর কহিলেন। 'যাও তো, রঘুনন্দন। এদের বাড়িটা দেখে এসো।...আর দেখো, তপন, তোমার দাদু বাড়ি এলে বলো, আজই সন্ধ্যার পর পদ্মপুকুরের রায়বাহাদুর প্রতাপ মুখুজ্জে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। যেন বাড়ি থাকেন...'

'আপ্‌প্‌নি!' তপন সবিস্ময়ে চাহিয়া কহিল। "আপনি আসবেন না। বড় নোংরা জায়গা। দাতুকে বললে তিনিই আপনার কাছে...'

'ঠিক আছে। আমিই আসব।' রায় বাহাদুর কহিলেন। 'আচ্ছা, এখন বাড়ি যাও।...'

বিদায়ের ভূমিকা হিসাবে এইবার তপন রাণীদেবীর দিকে সলজ্জভাবে একবার চাহিল। দেখিল, একদৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। তার তুই চোখই জলে ভরা। তপন আরও বিব্রত হইয়া পড়িল। এই রহস্যজনক আচরণের সে কোনই কূল-কিনারা পাইল না। কিন্তু ইহাদের সস্নেহ আচরণে যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

'তপন?'

'কেন, রাণীমা।'

'দূর, বোকা ছেলে। রাণীমা কি রে, শুধু মা। তোমার তো মা নেই, আমিই মা হলাম কেমন?...'

তপনের মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। পরম বিব্রতভাবে সে ঘাড় নাড়িয়া প্রায় নির্ব্বোধের মত জানাইল, 'আচ্ছা।'

দুই

স্নেহশীলা এক মহিলাকে মা বলিয়া ডাকা যত সহজ তাঁর কাছে গিয়া থাকিতে রাজি হওয়া তত সহজ নয়। এক সপ্তাহের চেষ্টায় ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডর ভবনাথ দাসকে রাজি করান গেছে, কিন্তু তপন বেঁকিয়া বসিয়াছে।

এবার ভবনাথ নিজেই তাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন।

'যা, তপন, যা। ওরা যখন এমন আগ্রহ করচেন, তখন তাদের কাছেই না হয় থাক গিয়ে। আর আমি তো কাছেই রইলাম। ভালো না লাগে, সেদিন ইচ্ছে চলে আসবি। এমন সৌভাগ্য ক'জনের কপালে আসে!···বলেছিল বটে কাশীর গণৎকার—এ ছেলের হাতে যে রাজলক্ষণ! তখন বিশ্বেস করিনি। এমন অভাগিনী যার মা, তার ছেলের রাজা হবার উপায় কোথায়। কিন্তু ভবিতব্য আটকায় কার সাধ্যি! তাই আমি বলছি, তুই যা তোর ভালো হবে...'

দৃষ্টি বইয়ের উপর নিবদ্ধ রাখিয়াই তপন জবাব দেয়, 'থাক, আমি ভালো চাইনে। যা আছি সেই ভালো আছি...তা বলে পরের বাড়ি গিয়ে থাকব?'

'ভগবান কোনখানে তোর বাড়ি ঠিক করে রেখেছেন, তার কি কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে।' ভবনাথ কহিলেন। 'নইলে আমার সংসারেই বা তুই ঢুকলি কি করে? কিন্তু ইচ্ছে করলেও আমি আর তোর কি করতে পারছি। গরিবের যে হাত-পা বাঁধা। সুযোগ পেলে কত বড় হতে পারবি, কত প্রতিষ্ঠা হবে, নাম

হবে, দশজনের একজন হয়ে উঠবি। এই বিধিদত্ত সুযোগ কেউ অবহেলা করে ?...'

রবিবারের ছুটি। আজ প্রায় সারাটা দুপুর ধরিয়াই ভবনাথ বালককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তপন কিছুতেই মানিতেছে না।

কাশীর ধর্ম্মশালায় এক মুমূর্ষু বিধবা তরুণী যখন মাত্র এক সপ্তাহের পরিচয়ে তাহাকেই সবচেয়ে বড় আত্মীয় মনে করিয়া তাহার বালক পুত্রকে ভবনাথের হাতে তুলিয়া দিয়া চিরদিনের জন্য চোখ বুজিয়াছিল, তখন কোন সন্দেহ বা সংস্কার বৃদ্ধের কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে বাধা দিতে পারে নাই। এই অজ্ঞাতকুলশীল বালককে তিনি গ্রহণ করিলেন। তার স্ত্রী-পুত্র কেহই জীবিত ছিল না। তপনের জন্য নতুন করিয়া বাসা পত্তন করিতে হইল।

ইহার পর বছর দশেক কাটিয়াছে। ভবনাথ বালককে নিজের নাতির মতো লালন করিতেছেন। অবর্ণনীয় মায়া জন্মাইয়াছে ইহার উপর। কিন্তু স্বার্থপর হইয়া তিনি কি ইহার উন্নতির অন্তরায় হইতে পারেন—তা তার নিজের যতই কষ্ট হউক না কেন। তা ছাড়া, তিন কুড়ি বারো বছর বয়স হইল। কবে আছেন, কবে নাই ঠিক কি। ইহাকে কি পথে বসাইয়া যাইবেন ? তপনের ভালোর জন্যই তাকে কঠিন হইতে হইবে।

•

'ভবনাথ বাবু বাড়ী আছেন কি ?'

'আসুন, কর্ত্তামশায়, আসুন।' বলিয়া তপনের প্রতি উপদেশ বন্ধ রাখিয়া ভবনাথ শশব্যস্তভাবে ঘরের ভিতর হইতে উঠোনে বাহির হইয়া আসিলেন।

'আজকে দিন ভালো। আজকেই নিয়ে যাব।' রায়বাহাদুর প্রতাপ মুখুজ্জে মাথাটা সাবধানে নিচু করিয়া বস্তির সদর দরজা পার হইয়া ভিতরে উপস্থিত হইলেন। 'ওর মা-ও সঙ্গে এসেচেন। বাইরে মোটরে বসে আছেন…'

'হ্যাঁ, নিয়ে যান, বাবুমশায়, আপনারাই নিয়ে যান। আমিও ভেবে দেখলাম, এতেই ওর হিত…দাওয়ায় এসে একবারটি বসুন। আপনার মতো ব্যক্তি আমার বাড়িতে এসেচেন, একি আমার কম সৌভাগ্য! একটু বসে যান।…ছেলেমানুষ কিনা, কান্নাকাটি শুরু করেচে। বলচে, না না, আমি এখেনেই থাকব। আমার বড় হয়ে কাজ নেই।…ও কিছু নয়। আমার মা জননীর আদরে দু'দিনেই মন বসে যাবে। তবে নেবার সময়টায় একটু গোলমাল করবেই।' বলিয়া ভবনাথ দ্বারের সংলগ্ন মাটির দাওয়ায় তার একমাত্র আসবাব বেতের বার্দ্ধক্যজীর্ণ মোড়াটা নিজের ধুতির কোঁচা দিয়া ঝাড়িয়া অতিথির ব্যবহারের জন্য সসম্মানে আগাইয়া দিলেন।

'আচ্ছা, দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করতে একটু সঙ্কোচ বোধ করচি,' রায়বাহাদুর আসন গ্রহণ না করিয়া কহিলেন, 'কিছু যেন মনে করবেন না। এর বংশ-পরিচয় কিছু জানেন কি?…'

'আজ্ঞে না, জানিনে', ভবনাথ দাওয়া হইতে উঠানে রায়বাহাদুরের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কহিলেন। যতটুকু আপনাকে আগে বলেচি, তার চেয়ে আর একটুও বেশি জানিনে। কিন্তু তার কিই বা দরকার, বাবুমশায়। এ মানুষেরই সন্তান, ভগবানের অংশ। বেঁচে থাকবার, কৃতী হবার, সুখী হবার পুরো অধিকার এরও আছে। সুযোগ পেলে এ-ও হয়তো একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে। একে আপনার বলে গ্রহণ করবার সময় আমি নিজেও যেমন অনাবশ্যক এর

জন্ম-পরিচয় জিজ্ঞেস করিনি, আপনিও তেমনি একে শুধু মানুষের সন্তান বলেই নিয়ে যান।...আমি নিজে গরিব মানুষ, লেখাপড়া বিশেষ শিখিনি, বস্তিতে বাস করি, কিন্তু এ কথাটা আমার বিশ্বেস করুন, কোনও মানুষই ছোট নয়। যাদের জীবন মিথ্যে হয়ে গেছে, নষ্ট হয়ে গেছে, সুযোগ পেলে তাদেরও অনেকেই মানুষ হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু অভাবের যে নোংরা আবহাওয়ায় আমাদের বাস করতে হয়, তাতে মানুষের মনুষ্যত্ব বাঁচতে পারে না। টাকার অভাবে যে সাধু ছিল সেও ঠগ জোচ্চোর হয়ে ওঠে। শিক্ষার অভাবে যে ভদ্র ছিল, সেও অভদ্র হয়ে ওঠে। পারিপার্শ্বিকের অবিচারে অত্যাচারে যে ধার্মিক ছিল, সেও অধার্মিক হয়ে দাঁড়ায়। এ দুর্ভাগ্য আমি নিজের চোখেই হাজারবার দেখেছি! তাইতো আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি হলুম। ভগবানের কৃপায় হতভাগ্যদের একজনও যদি বাঁচে, তাই বা মন্দ কি। যার চিরটা জন্ম ছোট হয়ে থাকার কথা, মাথা নিচু করে' থাকার কথা, উপযুক্ত সুযোগ পেলে সে-ও কতটা বড় হয়ে উঠতে পারে, একবার আপনার লক্ষ্মীর সংসারেই তার পরীক্ষা হয়ে যাক। লোককে আমরা ছোট করে' রাখি বলেই না তারা ছোট হয়ে ওঠে।...নিয়ে যান, আপনিই নিয়ে যান, বাবুমশায়।' বলিয়া সহসা ভবনাথ ধুতির কোঁচাটা নিজের চোখের উপর বার কয়েক ঘষিয়া বিব্রতভাবে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন।

রায়বাহাদুর প্রায় লজ্জা বোধ করিলেন। ছেলেটির জন্ম-পরিচয় সম্পর্কে কোনও কৌতূহলই তাঁর স্ত্রীর ছিল না। তাঁর নিজেরও যে খুব বেশি প্রয়োজন, এমন নহে; তবু বৈষয়িক সুস্থ-মস্তিষ্ক লোক হিসাবেই তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। দরিদ্র ষ্ট্যাম্প-ভেণ্ডর ভবনাথ দাসের উদারতার কাছে তাঁরও প্রশ্ন নীরব হইল। স্ত্রীর সান্ত্বনা হিসাবেই না

তিনি ছেলেটাকে বাড়িতে রাখিতে রাজি হইয়াছেন। তবে অনর্থক কেঁচো খুঁড়িয়া লাভ কি ?

'বাবুমশায়, একবার ভেতরে আসবেন কি।' ঘরের দরজা দিয়া মাথা গলাইয়া ভবনাথ প্রায় বিপন্নভাবে কহিলেন, 'আপনি নিজে এসে একটু বুঝিয়ে বলুন। বড্ড ছেলেমানুষ কিনা।...হয়ে যাবে, রাজি হয়ে যাবে...' শেষ কথা কয়টি রায়বাহাদুরকে আশ্বস্ত করিবার জন্য।

প্রতাপ মুখুজ্জে ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

তিন

রবিবার অপরাহ্ণে রায়বাহাদুর প্রতাপ মুখুজ্জে সব চেয়ে দামি গাড়িটা যখন ঘণ্টা তিনেক অনুপস্থিতির পর বাড়ির প্রকাণ্ড লোহার ফটকের সমুখে হাজির হইল, তখন সেটা যে অধৈর্য্য সঙ্কেতধ্বনি করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের নয়। দরোয়ান দ্রুত আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল। এক ঝাঁকুনি দিয়া শকটরাজ রায়বাহাদুরের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সযত্নরক্ষিত ফুল বাগানের সীমান্তবর্ত্তী পথ ধরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সুদূর গাড়ি বারান্দার দিকে ধাবিত হইল।

কলিকাতার বুকের উপর, যেখানে বাড়ি এবং মানুষের এমন ঠাসাঠাসি কাণ্ড, সেখানে কাহারও বাড়ি তিন বিঘা জমি জুড়িয়া রহিলে তাহা তাজ্জবের ব্যাপার বৈকি। কিন্তু যাহার সব চেয়ে বেশি অবাক হইবার কথা তাহার আর কোনও কিছুই উপলব্ধি করিবার অবস্থা ছিল না। একটা ভোজবাজীর মধ্যে পড়িয়া তাহার দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল।

'এস, বাবা। নেমে এস।' রাণীদেবীই প্রথমে নামিয়া পড়িয়া তপনের হাত ধরিয়া মৃদুভাবে টানিয়া কহিলেন।

তপন স্বপ্নের মধ্যে পা বাড়াইয়া দিল। ভাগ্যে রায়বাহাদুর পিছনেই ছিলেন, নইলে হোঁচট খাইয়া সে সিঁড়িতে মুখ-থুবড়াইয়া পড়িত।

গাড়ির হর্ণ শুনিয়া ইতিমধ্যেই চাকরেরা ছুটিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কর্ত্রীমার সাহায্য হিসাবে এখন তাহারা কি করিতে পারে, ভাবিয়া

পাইল না। নিউ মার্কেট হইতে বাজার আসিলে বা পিকনিক পার্টি হইতে বাড়ি ফিরিলে কি করিতে হয়, তাহারা জানে। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে কি করিতে হইবে? অবাক হইয়া ইহারা কর্ত্রীমার হাতে-ধরা নবাগতের দিকে চাহিয়া রহিল।

গাড়ির শব্দ শুনিয়া প্রবেশ-কক্ষের পাশের ড্রইং-রুম হইতে একটি দশ এগারো বছরের মেয়ে ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে পিছন হইতে চেঁচাইয়া কহিল, "কি দেরিই তুমি করতে পার, মা।...নীলা এসেছে, জানো। নীলা মাত্র একটু আগে...কে মা?...এতক্ষণ পরে মায়ের কাছে চাহিয়া সে অবাক হইয়া গেল। তার চোখে মুখে সবিস্ময় প্রশ্ন।

রাণী আশ্চর্য্য সংযত কণ্ঠে কহিলেন, 'উমা, আয়। তোর দাদা। তোর দাদাকে আমরা আবার ফিরিয়ে এনেছি। চিনতে পারচিস নে?...'

উমা ক্ষণকাল বিব্রত বোধ করিল।

'আয় উমা, তোর দাদাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যা।' এবার রাণীদেবীর কণ্ঠ আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

চকিতে উমা নিজের কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইল। পলকে দুই চোখে জল ভরিয়া উঠিল; কিন্তু তাড়াতাড়ি সে হাতের উপর দিকটা দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। বৃষ্টি-ভেজা রৌদ্রের মতো একটা সজল হাসিতে তার মুখটা সহসা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া কাছে আসিয়া সে তপনের দুই হাত মুঠায় চাপিয়া কহিল, 'দাদা!'

তপন কিছুই বলিল না। সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

সহসা পিছন হইতে আর একটি কিশোরী-কণ্ঠের হুইসিল শোনা গেল, "বাঃ রে, কাকীমা। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? আমি

কতক্ষণ হলো এসে বসে আছি। আমি খুব রেগে গেছি উমার ওপর···কে রে, উমা ?···'

'আমার দাদা। দেখছিস না, নীলা, আমার দাদা···'

নীলার কৌতুকোজ্জ্বল মুখটায়ও বিস্ময়ের রেখাপাত হইল।

রায়বাহাদুর অদূরে দাঁড়াইয়াছিলেন। পরিচয়-প্রসঙ্গ সহজ করিবার চেষ্টায় কহিলেন, 'তপন, এ তোমার বোন, উমা। আর ইনি উমার বন্ধু. আর আমার নীলু-মা। যাও, এদের সঙ্গে তুমি যাও। কিছু লজ্জা করো না।...একে ড্রইং রুমে নিয়ে বসাও।...বাইরের বারান্দায় চা দিক; কি বল ?' এটি তাঁর স্ত্রীর প্রতি। 'নীলুর নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে···'

'বাঃ রে আমার কেন ক্ষিদে পাবে।' নীলা প্রতিবাদ করিল। 'আমি তো এসেই গাছের তিনটে পেয়ারা খেয়েছি···'

'কাঁচা পেয়ারা খেয়েচিস শুনে তোর গবর্ণেস রেগে উঠবে না তো ?"

'বয়ে গেছে।" নীলা কহিল। "মেম বলে ডরাই কিনা। রাগলে তিন ধমক দিয়ে দিই। আমার সঙ্গে কথায় পারবে !···'

'কৌসলির মেয়ের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুস্কিল।' রায়বাহাদুর উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন।

সামান্য রসিকতার পক্ষে এত জোর হাস্য নিতান্তই বেখাপ্পা, কিন্তু থম্‌থমে আব্‌হাওয়াটা দূর করিবার জন্য তিনি আর কি-ই বা করিতে পারেন ? ইতিমধ্যে তিনি বার বার আড়চোখে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। যে কোনও মুহূর্ত্তে সে ভাঙিয়া পড়িতে পারে। স্বীকৃতি ও অপ্রত্যয়ের একটা প্রদোষক্ষণ চলিয়াছে। এটা পার হওয়া দরকার।

ড্রইং-রুমের বাহিরে ফুলের টব-ভর্তি বারান্দায় বৃহত্তর বাগানের মুখোমুখি চায়ের জায়গা দেওয়া হইয়াছে। বাগানের ওদিকে লোহার রডের উপর লোহার শিকলে দোলানো দোলনা। তার কাছেই অর্কিডের ঘর; পাখির ঘর। এই বারান্দা হইতে বিলিতি বাঁশের ঝাড়ে সে সব আধা ঢাকা। পাঁচিলের কাছে গুঁড়িমোটা পামগাছ, তাল, নারকেল ও কদমগাছ যেন দুর্গ-প্রাচীর সুরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছে।

ড্রইং-রুমের দিকে পিছন দিয়া চায়ের উপকরণ সাজাইয়া বসিয়াছেন রাণী। তাঁর ডান দিকের চেয়ারে রায়বাহাদুর বসিয়াছেন, এবং রায়বাহাদুরের দক্ষিণে পাশাপাশি দুটি চেয়ারে যথাক্রমে সকৌতুক মুখে নীলা ও উদ্‌গ্রীব উমা আসীন। উমা আর রাণীদেবীর মাঝখানে জড়সড় হইয়া যে বসিয়া আছে, সুযোগ পাইলেই সে এত সব লোভনীয় খাদ্যদ্রব্যের আকর্ষণ উপেক্ষা করিয়া এক ছুটে পাঁচিল পার হইয়া যাইত।

নীলার দুই চোখে পরিহাস চক্‌চক্ করিতেছে। এই অদ্ভুত ছেলেটার ভীতুমি এবং আনাড়িপনায় সে এতক্ষণে দশবার হাসিয়া উঠিত। কিন্তু কাকীমার মুখ গম্ভীর দেখিয়া এবং উমার কাছে ঠাট্টার সমর্থন না পাওয়ায় সে নীরব আছে। কিন্তু একেবারে নিষ্ক্রিয় নাই। বারবার পরিহাস-উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তপনের খাওয়ার রীতিটি লক্ষ্য করিতেছে।

'খাও বাবা, খাও।' রাণীদেবী আগ্রহ সহকারে কহিলেন। 'কিচ্ছু লজ্জা করো না। পেট ভরে খাও...'

উৎসাহিত বোধ করিয়া তপন গরম অমলেটের ভিতর আঙুল ঢুকাইয়া দিল। একটা চাপা আর্তনাদে টেবিলের সকলের চমকাইয়া উঠিতে দেরী হইল না।

রাণীদেবী সভয়ে কহিলেন. 'আঙুলে গরম লাগল বুঝি! সব সময়ে

রামধনি এই রকম একটা কাণ্ড ক'রে ছাড়বে। গরম অমলেট দিলে সঙ্গে যে একটা কাঁটা দিতে হয়…'

বাক্য-পূরণের আগেই রামধনি কাঁটা হাজির করিল। সেই কাঁটা তপনের আহত হাতে তুলিয়া দিয়া রাণী কহিলেন, 'নাও, বাবা, এটা দিয়ে ফুঁড়ে ফুঁড়ে খাও…'

নীলা আরও কণ্টকিত বোধ করিল। তাহার দৃষ্টি ইতস্তত নাচানাচি করিয়া বেড়াইতেছে। তার দুই চোখে প্রতীক্ষা।

সত্যই বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। তপন আনাড়ি হাতে বার দুয়েক কাঁটা চালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অমলেট যতই নিরীহ দেখিতে হোক, সে-ও লোক বুঝিয়া পা চালাইতে জানে। এই পদাঘাতে তপনের হাতের কাঁটা ছিট্‌কাইয়া স-আর্ত্তনাদে ভূমিশায়ী হইল।

'থাক, বাবা, থাক', রাণী সভয়ে কহিলেন। 'এবার হাত দিয়েই খাও, জুড়িয়ে গেছে।…'

তপন বাঁচিল। একান্ত বাধ্যতাসহকারে সে এই আদেশ পালনে মনোযোগ দিল। ফলে, অমলেট্ উড়িয়া গেল, পাঁউরুটি উধাও ও স্যাণ্ড্-উইচ হাওয়া হইল, এবং কেকের টুকরাগুলি অদৃশ্য হইতে কিঞ্চিৎমাত্র দেরি করিল না!

বাড়িতে একটি নতুন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে যেমন তাহার জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়, চারিদিকে একটা ব্যস্ততা পড়িয়া যায়, এ বাড়িতেও সেই চঞ্চল সাড়া পড়িয়াছে। রামধনি বেয়ারা জামা-কাপড়ের দোকানে জুতার দোকানে, তোয়ালে-সাবান, টুথব্রাশ-চিরুণীর দোকানে ছোটবাবুর ছুটাছুটি করিয়া হয়রান হইতেছে।

এইবার সে কোথায় শুইবার ব্যবস্থা হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিল। এবার বকা খাইল।

এ কাজটি রাণী নিজেই করিবেন। ড্রইং-রুমে পাঠরত স্বামী ও রেডিয়ো শ্রবণ-রত ছেলেমেয়েকে অন্যমনস্ক দেখিয়া রাণী একসময় চুপে চুপেই কর্তব্য-সম্পাদনে বাহির হইয়া পড়িলেন। ক্লান্তপদে সিঁড়ি দিয়া তিনি দোতলায় উঠিয়া আসিলেন। কোণার এই ঘরটি বাড়ির শ্রদ্ধায় ও বেদনায় মণ্ডিত। এ ঘরেই রাণীদেবীর প্রাণাধিক পুত্র শঙ্কর শুইত; এঘরেই সে পড়িতে ভালোবাসিত। এই ঘরে ঢুকিতে রাণী আজ প্রায় কণ্টকিত বোধ করিলেন।

ঘরের এক প্রান্তে পুরু স্প্রীংয়ের গদি-আঁটা সিঙ্গেল খাট চাদর-বালিসহীন পড়িয়া আছে। ইহার অপর দিকে কাচের দরজা-অলা প্রকাণ্ড জামা-কাপড়ের আলমারি। ঘরের অপর প্রান্তে লেশ-আঁটা, নিচের বাগান দেখা-যাওয়া জোড়া-জানালার কাছাকাছি চকচকে একটা পড়ার টেবিল ও ছোট একটা চেয়ার। টেবিলের একদিকে জানালার পাশে একটা আরাম-চেয়ার ও অপরদিকে বই-ভরা ঘূর্ণ্যমান বুক্-কেস। টেবিলের উপর চকচকে দোয়াতদানি এবং কলম ও টেবিল-ল্যাম্প আছে, কিন্তু এগুলি ব্যবহারের কোনও লক্ষণ নাই।

নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া রাণী আলমারির কাছে অগাইয়া গেলেন। একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন নিষ্ক্রিয়ভাবে। আঁচলে চাবির গোছার সঙ্গে কতকগুলি ঝঙ্কার-পড়া চাবির আর একটা রিং ঝুলিতে-ছিল, সেটা তিনি ধীরে ধীরেই খুলিয়া লইলেন।

আলমারির গা-তালার চাবি ঘুরাইয়া দরজা খোলা মাত্র ঘড়ঘড় করিয়া একটা শব্দ হইল। মুহূর্ত্তে রাণী চমকাইয়া উঠিলেন। প্রায় লজ্জিত বোধ করিয়া তিনি দরজার দুপাটই খুলিয়া লইলেন।

উপরের দুটো তাক কাপড় জামায় ঠাসা। নিচের তাকে নানা ধরণের অনেক জোড়া জুতো। ভারমুক্ত হইয়া যে চলিয়া গিয়াছে, তাহার বেদনাদায়ক স্মৃতিচিহ্ন! এই পরিত্যক্ত কাপড়-জামার উপর একবার বুভুক্ষু হাত বুলাইয়া রাণী আঁচলে চোখ মুছিলেন।

এক এক করিয়া কাপড়-জামাগুলি নিচে নামান হইল। স্তূপীকৃত ধুতি, পাঞ্জাবি, শার্ট, হাফ্‌পেণ্ট ও স্যুটের মধ্যখানে রাণী নিজেও নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। মমতাভরে এটা নাড়িলেন, ওটা নাড়িলেন। যেন একটা প্রিয়স্পর্শ খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহসা একটা বিছানার চাদরের ভাঁজ হইতে একটা ফটো তাঁর কোলের উপর গড়াইয়া পড়িল। রাণী শিহরিয়া উঠিলেন। দুই হাতে তুলিয়া লইলেন মৃত পুত্রের প্রতিকৃতি; অপলক চোখে চাহিয়া রহিলেন। অশ্রুতে দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিল। রাণী কাঁদিতে লাগিলেন।

'মা, তুমি কোথায়? দেখো না এসে, দাদা একটি কথা বলছে না।···এই তো, তুমি এইখানে···' বলিতে বলিতে উমা ঘরে ঢুকিল। 'তুমি না এলে দাদা কিছুতেই···ও কি!'

উমা তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিল। একবার স্তূপীকৃত জামা-কাপড়ের দিকে চাহিয়া দেখিল, ক্রন্দমান মাকে গভীর সহানুভূতির সঙ্গে নিরীক্ষণ করিল, তারপর অদ্ভূত বিচক্ষণতার সঙ্গে কহিল, 'দাদা তো ফিরেই এসেছেন, তবে আর কাঁদচ কেন, মা? তুমিই তো আমাকে বল্লে, এ তোর দাদা, উমা। তোর দাদাকে আমরা ফিরিয়ে এনেচি। তুমি মিছিমিছি কাঁদলে আমিও কিন্তু আর দাদা বলে ডাকব না···'

রাণীদেবী চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। শান্তকণ্ঠে কহিলেন, 'সত্যি উমা, আমিই ছেলেমানুষি করছি। হ্যাঁ, তোর দাদা বৈকি। দাদা

বলেই তো তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি। নতুন রূপে সে আমাদের মধ্যে আবার ফিরে এসেচে।·· যা তো মা, এই ঘরে তাকে নিয়ে আয়। এইটেই তো তার ঘর। এই ঘরে সে এসে থাকুক। এই জামা-কাপড় সে পরুক। এই খাটে সে শুক। ঐ টেবিলে সে লেখাপড়া করুক। সারা ঘরময় সে দাপাদাপি করে বেড়াক···'

'যাই মা, আমি ডেকে আনি।' বলিয়া উমা ঘর হইতে পলকে ছুটিয়া পালাইল।

চার

বিনা অপরাধে একজন নির্দ্দোষ লোককে যদি পুরাপুরি তিন তিনটা দিন অবিচ্ছিন্ন কয়েদ ভোগ করিতে হয়, তবে নিশ্চয়ই তার মুখের চেহারা খুব প্রসন্ন দেখায় না। তপনের মুখও প্রসন্ন নয়। আদরের কারাগারে সে ছটফট করিয়া মরিতেছে। আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের আবহাওয়াটা একান্ত অস্বাভাবিক মনে হইতেছে। মন পালাই-পালাই করিতেছে। অথচ পালাইবার মত সাহসও নাই।

কিছুক্ষণ আগে রাণী তাকে শোবার ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া রাতের কাপড় পরিয়া লইতে বলিয়া বিদায় লইয়াছেন। মায়ের এই নির্দ্দেশ পালন না করিলেই নয়; তপন ডোরা-কাটা কাপড়ের স্লিপিংস্যুটের ভিতর নিজেকে ঢুকাইয়া ফেলিয়া অস্বস্তিতে সারা হইতেছে। কিম্ভুতকিমাকার সাজ! কি অদ্ভুতই না তাকে দেখাইতেছে! আলমারির আয়নায় তপন বারবার নিজেকে দেখিতে লাগিল। হাফ্-প্যাণ্ট বা ধুতি পরিয়া ঘুমাইলে এমন কি ক্ষতি হইত! গলাবন্ধ কোটটার গলার বোতাম না খুলিলে তার যেন দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। আর কেবলই মনে হইতে থাকে, পিছনে একটা লেজ গজাইয়া গিয়াছে! বারবার সে হাত দিয়া অনুভব করে। আর পা দুটো এমন ভাবে ঢাকা থাকিলে কার না অস্বস্তি লাগে। রোজই তাহাকে পায়জামার পা হাঁটু পর্য্যন্ত গুটাইয়া ফেলিতে হয়। আজও সে অনুরূপ ঠ্যাং মুক্ত করিল।

'রাতের জন্য আর কিছু চাই, ছোটবাবু?'

তপন চমকাইয়া চাহিল। রামধনি বেয়ারা সেদিনের জন্য শেষ তদারক করিতে আসিয়াছে। পায়জামার অবস্থাটা আড়চোখে সভয়ে লক্ষ্য করিয়া ইতিমধ্যে চোখের দৃষ্টি সে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিয়াছে।

তপন মুখে কিছু বলিল না। হাত নাড়িয়া জানাইল, 'এবার বিদায় হও তো।' তাহার অস্বস্তিকর অবস্থাটা সে অন্যদের দেখা পছন্দ করে না। আর রাতেই বা মানুষের কি দরকার হইতে পারে! দরকার যদি হয়ই, তবে তার নিজের হাত এবং পা জোড়া আছে কিসের জন্য?

তপন আবার আয়নায় নিজের সাজের প্রতি মনোযোগ দিল। এইবার একটা ভেংচি না কাটিয়া পারিল না।

আর বিছানাটা লইয়াও প্রত্যহ এক হাঙ্গামা। নিজেদের বাড়িতে যেমন করিত, তেমনি সটান ইহার উপর লাফাইয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া রোজই এই বিপদ হয়, আবার রোজই ভুল করিয়া সে খাটের উপর লাফাইয়া ওঠে। আজও সে স্প্রিংয়ের গদির বিক্ষোভে বিছানার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। এমন বিছানাও লোকে বাড়িতে রাখে! শক্ত বিছানা এর চেয়ে অনেক ভালো। অনেক নির্ভরযোগ্য।

আর এই পাখাটা! গত তিন দিন ধরিয়া সমানে এটা তাকে যন্ত্রণা দিতেছে। মাথার উপর সারাক্ষণ যদি একটা কিছু ঘুরিতে থাকে, তবে একেই তো অস্বস্তি হয়, তার উপর হাওয়ার দৌরাত্ম্যে শীগগিরই কাঁপুনি ধরিয়া যায়। একটা চাদরে সেই শীত-কাঁপুনি আটকানো অসম্ভব।

দু'পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতে আবার হাঁচি শুরু হইয়া গেল। তপন স্থির করিল, এ অত্যাচার সে নীরবে সহ্য করিবে না।

সুইচ-বোর্ডে বোতাম টিপিয়া আলো জ্বালানো এবং নিভানোতে সে অভিজ্ঞ, কিন্তু ভীমরুলের চাকের মতো গোলাকার পাখার সুইচটার

রহস্ত তার অজ্ঞাত। কিন্তু ইতিমধ্যেই সে ইহাকে লইয়া নাড়াচাড়া লক্ষ্য করিয়াছে। এইখানে আক্রমণ চালাইতে পারিলেই যে নির্লজ্জ পাখা কাবু হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি।

ক্ষতি বিশেষ হইল না। শুধু অনভ্যস্ত আঙুল রেগুলেটের এক নিষিদ্ধ ফাটলে ঢুকিয়া পড়ায় সীমান্তরক্ষী বিদ্যুৎ-বাহিনী গুলি চালাইল। তপন অনুচ্চ চীৎকারে তিন হাত দূরে মেঝেতে ছিটকাইয়া পড়িল, আলমারির এক কোণায় মাথা ঠুকিয়া গেল। মনে হইল, মরার আর দেরি নাই। কিন্তু তার সিদ্ধান্ত শীঘ্রই অমূলক প্রমাণ হওয়ায় প্রথমেই আলমারির উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া ছাড়িল। কাঠের উপর বেশ কয়েকটা ঘুষি বসাইয়া তবে তার রাগ কমিল।

কিন্তু পাখার ভ্রূক্ষেপই নাই। সে নির্ব্বিকারভাবে তার কর্ত্তব্য পালন করিয়া চলিয়াছে। তপন ইহাকে আর ঘাঁটাইবার চেষ্টা করিল না। অত্যন্ত অভিমানভরে ওদিকের জানালার কাছের ঈজিচেয়ারটায়ই রাত-কাটানো সিদ্ধান্ত করিল।

এ সব অসুবিধা ভোগের পর সে যদি সকাল হইতেই অদৃশ্য হয়, তবে মুখুজ্জে-পরিবার যতই সন্ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া উঠুক, তপনকুমারকে কি খুব দোষ দেওয়া যায়! অন্তত বকুলবাগান তিন নম্বর বস্তির সরু গলিটা দোষ দিল না। তপন ছুটিতে ছুটিতে নিজেদের বাড়ির সদর-দরজায় ঢুকিয়া পড়িল।

টাইমের ঝি ভূতির মা উঠোনের এক প্রান্তে গত রাত্রের এঁটো বাসন ধুইতেছিল, চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, 'ও কে, ছোটবাবু! তুমি হেথায় কেন! তুমি না রাজার বাড়িতে রাজার ছেলে হয়েচ, রাণী

মা নিজে এসে তোমাকে কোলে বসিয়ে নিয়ে গ্যাচেন ?···বাঃ, এই তো সাজ। এই পোষাকেই তো তোমাকে মানায় ! কিন্তু চলে এলে কেন, বল দিকিনি ? তাড়িয়ে দিলে না তো ? বড়লোকের···'

'তোর মুণ্ডু।' তপন মর্য্যাদার সঙ্গে কহিল। 'আমি নিজেই চলে এসেচি। ওখানে আবার মানুষ থাকে। যত সব অসুবিধের কাণ্ড ! দাদু কই···'

'উনি যে এই মাত্তর বেইরে গেলেন।'

'চাবি দিয়ে গেচে তোর কাচে ?'

'হিঁ।'

'দে তবে চাবি। বিছানাতে একটু আরাম করে শুই।···জন্মে আর আমি ওমুখো হচ্চি না···'

কিন্তু এ সংকল্প রাখা গেল না। এক ঘণ্টারও আগে রাজবাড়ির পাইক হাজির হইল।

গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিটা টানিয়া খুলিয়া ক্রুদ্ধভাবে সেটাকে দুম্‌ড়াইয়া মোচ্‌ড়াইয়া তপন সেটাকে একদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। গায়ের ফর্শা গেঞ্জিটা তারপরও কিছুক্ষণ গায়ে ছিল, কিন্তু সেটার প্রতি নজর পড়াতে আবার অস্বস্তি শুরু হয়। ফলে সেটাও পাঞ্জাবির অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতক্ষণ পরে বেড়ার গা হইতে ময়লা ছেঁড়া শার্টটা পাড়িয়া তাহা গায়ে পরিয়া তপন নিতান্ত আরাম বোধ করিতেছে, এবং তক্তপোষের শক্ত ময়লা বিছানাটায় শুইয়া পায়ের উপর পা তুলিয়া দিয়াছে। এমন সময় দুঃস্বপ্নের মত একটা সুপরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'খোখাবাবু !'

তপন প্রমাদ গণিল।

মোটরচালক রঘুনন্দনের পিছনে স্বয়ং মা আছেন কি ? তবে আর

উপায় নাই। তবে আবার ফিরিতেই হইবে। এমন বিপদেও লোকে পড়ে!

'উঠে আসুন, ছোটবাবু। মা-জী গাড়িতে বসে আছেন।' রঘুনন্দন মেটে-ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া কহিল।

'না, যাব না, যাব না,' তপন মরিয়া হইয়া কহিল। 'বলে দাও, আমি কিছুতেই যাবনা।'

'তবে মা-জী আপনিই চোলে আসবেন। কেনো তকলিফ্ দিচ্ছেন।...আসুন, ছোটবাবু। বস্তির ভিতর মা-জীকে ঘুসাবেন?...'

'মা-জীকে ঘুসাবেন!' বলিয়া ভেংচাইয়া তপন অনিচ্ছুকভাবে বিছানা ত্যাগ করিল।

তপন পুনর্মূষিক হইল।

পাঁচ

এই পালাই-পালাই ভাবটা কয় মাসের মধ্যেই দূর হইয়া গেল।

এখনও বৃদ্ধ ভবনাথ দাস মাঝে মাঝে আসিয়া তপনকে দেখিয়া যান, তবে ইদানীং তার আসা-যাওয়া অনেকটা কমিয়াছে। ভারি বুদ্ধিমান লোক ভবনাথ। রায়বাহাদুরকে একদিন চুপেচুপে কহিয়াছেন, "মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই, বাবুমশায়। দূরে থাকার অভ্যেস করচি।" জীবনের শেষ দিনগুলি কাশীতে বিশ্বনাথের চরণাশ্রয়ে কাটাইবার বাসনা। রায়বাহাদুর একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, ভবনাথ রাজি হইতেছেন না। বলিতেছেন, "একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়লে আপনিতো আছেনই, বাবুমশায়। চেয়ে নেব। এতে আমার কোনও লজ্জা নেই।"

তপন পড়াশুনায় মনোযোগ দিয়াছে। দুইজন দোর্দণ্ড প্রাইভেট-টিউটরের হাতে রীতিমতো কাপড়-কাচা হইবার পর এবার সে মিশনারী স্কুলে ম্যাট্রিক-ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে পারিয়াছে। ইংরেজিতে এখনও একটু কাঁচা। সাহেব মাষ্টারের কাছে পড়িয়া এবং বহু শ্বেতাঙ্গ সহপাঠীর সাহচর্য্যে তার এই ভাষার জ্ঞানে কিছু উন্নতি হইতে পারে, এমন আশা করা হইতেছে।

ইংরেজির মতো অঙ্ক, ভূগোল এবং আরও দু' একটা বিষয়েও সে কাঁচা ছিল। কিন্তু এ বিষয়গুলিতে সে আশ্চর্য্য রকম উন্নতি করিয়াছে। ঠিক মতো বুঝাইতে পারিলে দুরূহ বিষয়ও সে সুন্দর বুঝিতে পারে। অথচ প্রথমে তার অভিজ্ঞতা দেখিয়া ঝানু প্রাইভেট-টিউটরেরা পর্য্যন্ত

ঘাবড়াইয়া গিয়াছিলেন। সহসা ছাত্রের এই অভাবনীয় উন্নতিতে তারা রীতিমত উৎসাহিত বোধ করিলেন। রাণীদেবীর ব্যগ্র প্রশ্নের জবাবে দুজনে একবাক্যে কহিলেন, 'গাধা-গরু পিটিয়েই এম, এ পাস করিয়ে দেওয়া যায়, এ তো চালাক ছেলে! আরও একবছর যদি লেগে থাকি, এ ছেলে জলপানি না পেয়ে যায় না।'

দুজনেই আরও এক বছর চাকরির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। হইলেন না শুধু রাণী নিজে। স্বামীকে বারবার কহিলেন, "এ কখনও হয়। তুমি নিজে একটু দেখো। যে ছেলে চার চারটে বিষয়ে এমন ভয়ঙ্কর কাঁচা ছিল, সে কখনও মাত্র ছ'মাসে এতটা শুধরে নিতে পারে?···

"এখনও শুধ্‌রে নেয় নি, তবে উন্নতি করেছে।" রায়বাহাদুর জবাব দেন। "মানুষের বুদ্ধি এবং মন দুটোই ভারি আশ্চর্য্য জিনিষ। কোথায় একটা লুকানো বোতাম আছে। ঠিক জায়গায় টিপতে পারলে অদৃশ্য আলো ঠিক্‌রে বেরিয়ে সব উজ্জ্বল করে তোলে···। গুরুর সার্থকতাই এইখেনে···

'যার বোতাম টেপবার লোক না থাকে, তার কি হয়?'

'সে বাড়তে পারে না।' রায়বাহাদুর কহিলেন। 'যেখানে তপন ছিল, সেখানে এই সুযোগ হয়ত তার আসতই না।···এক স্কুল। কিন্তু আমাদের সাধারণ স্কুলগুলি কি রকম হয় জানতো। ছাত্রদের মাইনে কম; খরচ ওঠাবার জন্য বেশি ছাত্র ভর্ত্তি করতে হয়। মাষ্টারেরা সামান্য মাইনে পান। সংসার চালাবার জন্য তাঁদের প্রাইভেট-ট্যুশনি করতে হয়। স্কুলের বারোয়ারী ব্যাপারে তাঁরা গোঁজামিল দেবার চেষ্টা করেন। আলাদাভাবে ছেলেদের দিকে নজর দেবার কথাই ওঠে না। যে সব ছাত্রের অন্য সঙ্গতি নেই, তাদের

অধিকাংশই কাঁচা থেকে যায়। তাদের নিজস্ব ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ হয় না...'

'ভাগ্যিস তপনকে আমরা নিয়ে এসেছিলাম।' রাণী শিহরিয়া উঠিয়া প্রায় স্বগতোক্তি করেন।

নানাদিক হইতেই তপনের নানা পরিবর্তন হইয়াছে। ফিট্‌ফাট হইয়া থাকিতে আর সে অস্বস্তি বোধ করে না। দামি জামা-কাপড় পরিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। একটু বেশি বাবুই হইয়া পড়িয়াছে। রায়বাহাদুর একদিন এ সম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে মন্তব্য করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'একেবারে এতটা বাবু করে তুলো না, টাল্ সামলাতে পারবে কেন?' রাণী কিন্তু এই সাবধানবাণী সমর্থন করেন নাই। তিনি জবাব হিসাবে বলেন, 'বাবু করে তুলব কেন? এতগুলি বছর ধরে অপরিষ্কার জায়গায় বড়ো হয়ে উঠেচে; সেই নোংরামির ছাপটা চাপা দিতে হবে তো।'

স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এই নতুন খেলায় মাতিয়া গিয়াছেন।

'উমার সঙ্গে তপনও একটু গান শিখলে পারে না?'

'ওমা, ব্যাটা ছেলে তার গান শিখে কি হবে গো?' রাণীদেবী স্বামীর প্রস্তাবে বিস্মিত হন। 'গান শিখে ফিল্মে নামবে নাকি ..'

'কদিন আগে একটা বই পড়ছিলাম।' রায়বাহাদুর কহিলেন। 'তাতে অ্যারিস্টটট্‌ল্-এর মত তুলে দিয়ে বলা হয়েচে, গান প্রকৃত শিক্ষার একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাতে মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, হৃদয়ের প্রসারতা বাড়ে...'

"তবে হপ্তায় দু' এক ঘণ্টা করে' শিখুক না।' এইবার রাণী আগ্রহান্বিত হইয়া কহিলেন।

তপনের গানের প্রচেষ্টা অবশ্য বেশি দূর অগ্রসর হইল না। টেস্ট্ পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহাকে ওস্তাদের হাত হইতে রক্ষা করিল। তপন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

'একটা জিনিষ লক্ষ্য করেচ?' একদিন রাণীদেবী স্বামীকে কহিলেন।

'কি জিনিষ?'

'এখনো কেমন ভীতু রয়ে গেছে ছেলেটা। মুখ নিচু করে থাকে। কথার জবাব দিতে হলে তোতলায়। নতুন জায়গায় নিয়ে গেলে জড়সড় হয়ে পড়ে।...'

'এসব ক্রমে চলে যাবে।' রায়বাহাদুর ভরসা দিয়া কহেন। 'অন্যদের বাড়ির পার্টিতে-নেমন্তন্নে ওকে নিয়ে যাওয়া শুরু করো। আড়ষ্ট ভাবটা কেটে যাবে। গম্ভীর ভাবটা এরই মধ্যে অনেকটা কেটে গেচে। যে আবেষ্টনে ওর শৈশবটা কেটেছে, এ তার সবই প্রভাব। নীচু স্তরের লোকের মধ্যে নিকৃষ্টতাবোধ জন্মায়; বঞ্চিতের মধ্যে অনর্থক গাম্ভীর্য্য দেখা দেয়।...'

তপনের মধ্যে সহজাত গুণ অনেকগুলিই স্বামী-স্ত্রী ইতিমধ্যে লক্ষ্য করিয়াছেন। সে বুদ্ধিমান। তার স্মরণশক্তি ভালো। তার মন স্নেহপ্রবণ। পরিচ্ছন্নতার দিকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। তার মনটা বড়ো। সহানুভূতিবোধ অত্যন্ত জাগ্রত।

তার আগের স্কুলের ফটকের সামনে টিফিনের পয়সা হইতে সে যখন রাণীদেবীর চোখের সামনেই ভিক্ষুক বুড়িকে তার অর্দ্ধেক সম্বল দান করিয়াছিল, তখনই মুগ্ধ হইয়া রাণী এই বৃত্তিটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এখন এই বৃত্তিটিই আবার তাহার উদ্বেগের কারণ হইয়া পড়িতেছে।

একদিন তো নিজের পায়ের জুতোটাও সে খয়রাতি করিয়া স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিল।

রাণী উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'শুধু পায়ে গাড়ি থেকে নামলি মনে হল রে, তপন। জুতো কোথায় ফেলেছিস···'

তপন নীরব থাকিলেও রঘুনাথ নীরব রহিল না। সে অভিযোগ করিয়া কহিল, 'ছোটবাবু ভিখিরিকে জুতো দিয়ে দিয়েছেন···'

'ভিখিরিকে! সে কি রে! অমন চকচকে জুতো দিয়ে ভিখিরি কি করবে? সবাই ভাববে, চুরি করেচে! ক'টা পয়সা দিয়ে দিলেই হতো··'

'কুষ্ঠরোগী কি না, তাই দিয়ে দিলাম, মা।' তপন কুণ্ঠিতস্বরে কহিল।

'কুষ্ঠরোগী!' রাণী আরও বিস্মিত হইলেন।

'শুধু পায়ে চলতে ভারি কষ্ট হয়।' এবার তপন একটু সাহস পাইয়া জানাইল। 'আর তা ছাড়া, ফুটপাথে পুঁজটুঁজ লাগলে অন্যদেরও ভয় থাকে।···আমার তো আরও অনেক জুতো আছে···"

'দিয়ে ঠিকই করেচ, বাবা।' রাণী অভিভূত হইয়া কহিলেন।

এমনি করিয়া একটা বছর কাটিয়া যায়।

আজ হইলেই তপনের টেস্ট্ পরীক্ষা শেষ হয়। গত ক'টা দিন রাণীর দারুণ উদ্বেগে কাটিয়াছে। পরীক্ষা যেন তপন দিতেছে না, রাণীই দিতেছেন।

পাঁচটায় পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। উভয় গৃহশিক্ষকই ছাত্রের অপেক্ষায় আসিয়া বসিয়া আছেন। সন্ধ্যা ছ'টা বাজিয়া গেছে। রাণী অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেছেন। রায়বাহাদুর নিজেই অফিস হইতে ফিরিবার মুখে তপনকে তুলিয়া আনিবেন, বলিয়া গেছেন। সওয়া পাঁচটা, বড়

জোর সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি পৌঁছিবার কথা। এখনও কাহারও দেখা নাই।

ইতিমধ্যে ক্লাইভ স্ট্রীটে রায়বাহাদুরের নিজস্ব অফিসে তিনবার টেলিফোন করা হইয়াছে। একই জবাব পাওয়া গেছে—উনি পৌনে পাঁচটায় বেরিয়ে গেছেন, আর ফিরিয়া আসিবেন না।

'উমা ?'

'কি মা।'

'আর একবার টেলিফোন করত, মা।'

'কোথায়, অফিসে ?' উমা পাশের কামরা হইতে মায়ের কাছে হাজির হইয়া কহিল।

'নইলে আর কোথায়।' একটু বিরক্তভাবেই রাণী কহিলেন।

উমা মৃদু হাসিয়া কহিল, 'একই নম্বর বারবার চাইলে আর কনেকশনই দেবে না।···বাবা তো নিজেই গেছেন। সময় হলে আসবেনই।'

'মাস্টামশাইদের জলখাওয়ার দেওয়া হয়েছে ?'

'হ্যাঁ, মা।'

'তোর গানের মাস্টারমশায় কাল তো আসেন নি ?'

'কাল তো দিন ছিল না। আজ আসবেন···ঐ শোনো, এসে পড়েছে! তোমার কেবল সবটাতে মিছিমিছি ভাবনা।' বলিয়া মোটরের হর্ণ-এর ডাকে উমা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

'কি রকম পরীক্ষা দিয়েছিস, বাবা ?'

'এক রকম হয়েচে, মা।'

'তোর ঐ এক কথা! ম্যাট্রিকে জলপানি পেতে হবে কিন্তু, বাবা।'

'কত ভালো ভালো ছেলে আছে···'

'তুই বা কম কি। কেবল নিজেকে ছোট মনে করবে!' রাণী অনমুমোদনের কণ্ঠে কহিলেন। 'এবার যা, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে তাড়াতাড়ি আয়। ক্ষিদে পায় না?···এ কি রে, কোথা থেকে চুল ছাঁটিয়ে এলি!···

'বাবা সাহেবের দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন চুল ছাঁটাতে। তাই তো বাড়ি আসতে একটু দেরি হলো!···'

'ওরে বাবা! সাহেবের দোকানে আবার চুল ছাঁটানো কেন? ইদিকে পেটে কিছু পড়েনি, সেদিকে খেয়াল নেই। এবার শীগ্‌গির তৈরি হয়ে আয়···'

রায়বাহাদুরই প্রথমে চায়ের জন্য তৈরি হইয়া আসিলেন।

'আমিই নাকি ছেলেকে বাবু বানাচ্ছি,' রাণী সহর্ষেই কহিলেন। 'আর ইদিকে নিজে ছেলেকে সাহেবের দোকানে চুল ছাঁটিয়ে আনা হচ্ছে। এর কি দরকার ছিল?···'

'সাহস বাড়বে।' রায়বাহাদুর চায়ের টেবিলের সমুখে বসিয়া কহিলেন। 'তাছাড়া সাহেবদের ওপর আমাদের একটা অহেতুক সম্ভ্রম আছে। এটা পরাধীনতার ফল। সাহেবী দোকানে চুল ছাঁটাতে নিয়ে গেলাম বাবুগিরি শেখাতে নয়, ওকে দেখাতে যে, সাহেব নাপিতও হয়, তারা এমন কোনও অতি-মনুষ্য নয়। এতে ওর মাত্রাবোধ জন্মাবে···'

'তোমার রায়বাহাদুর উপাধিটা আর কিছুতেই টিকবার নয়!' রাণী মৃদু পরিহাসের কণ্ঠে কহিলেন।

'না, এর মেয়াদও বেশি দিন নেই। দেশ এবার স্বাধীন হবেই।'

'তবে আগে থাকতে ছেড়ে দিলেই হয়।'

'ওরে, বাবা। ইংরেজ যৎদিন আছে, ঘাঁটিয়ে লাভ কি। তবু ব্যবসা করে' দু'চার পয়সা করে' খাচ্ছি।'

ছয়

এক অভাবিত ব্যাপারে তপনের শঙ্কিত ভাবটা দূর হইয়া গেল।

টেস্ট পরীক্ষার ফলাফল জানিতে স্কুলে গিয়াছিল। যখন ফিরিয়া আসিল, চোখমুখ ফোলা, কপালে ও নানা জায়গায় প্ল্যাস্টারের পটি।

রাণী ছুটিয়া আসিয়া প্রায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। ডাক্তারের কাছে লোক ছুটিয়া গেল। একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। তপন কিন্তু জেরার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করিল না। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তরেই কহিল, 'ও কিছু নয়।'

'কিছু নয় কি রে!' রাণী সভয়ে কহিলেন, 'সারা মুখটাই যে কেটে একশা হয়েচে। চোখ ফুলে উঠেচে। কপালে আঁচড়ের দাগ। কার সঙ্গে মারামারি হয়েচে, বল?'

'ও কিছু নয়।' তপন একই জবাব দিল।

'কি একগুঁয়ে ছেলে হয়েচিস।' রাণী হতাশ হইয়া কহিলেন।

খবরটা বাহির করে উমা। বাড়ির মধ্যে ইতিপূর্ব্বে সে-ই তপনের একমাত্র অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সঙ্গে তপন স্বাভাবিক আচরণ করিতে পারিত। এইবার সেই তপনকে লইয়া পড়িল।

সারাটা বিকাল সে দাদাকে লইয়া বিভিন্ন ফুলগাছের সূক্ষ্ম তদারক করিয়া বেড়াইয়াছে। এইবার সন্ধ্যার মুখে সে তপনকে অনুসরণ করিয়া তপনের কাম্‌রায় তাহার পড়ার টেবিলের সামনে একটি চেয়ারে আসীন হইয়াছে। অজুহাত ক্লাসের টাস্ক্‌ করাইয়া লওয়া।

'তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না, দাদা।'

'হুঁ, তোকে বলেচে।' তপন জবাব দিল।

'তবে বুঝি চুপিচুপি আমাকে বলতে না?'

'কি বলতাম না?'

'কি আবার। কাদের সঙ্গে মিছিমিছি ঝগড়া করে' এসেচ, তার আমি কি জানি!'

'হ্যাঁ, মিছিমিছি ঝগড়া বৈকি!' তপন সপ্রতিবাদে কহিল। 'তারা আমাদের সমস্ত জাতটাকে ঠাট্টা করে যাবে, আর আমি চুপ করে যাব, কেমন?...'

এতটা বলিবার পর বাকিটা বলিতেই হইল।

নোটিশ-বোর্ডে 'অ্যালাউড্' ছাত্রদের লিস্ট্ দেখিবার জন্য তপন ভিড়ের পিছনে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার পালা আসিলে সে যখন আগাইয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছে, তখন গোটা কয়েক ফিরিঙ্গি ছেলে পিছন হইতে তাহাকে ঠেলা দিয়া কহিল, 'গেট্ আউট্, ইউ নিগার। লেট্স্ গো ফার্স্ট!...'

'কেন, আমি আগে এসেচি। চুপ করে' পেছনে দাঁড়াও।' তপন জবাব দিল।

তাহারা সকলেই তাহার সহপাঠী, কিন্তু স্কুলের অলিখিত নিয়ম অনুসারে ইহারা ভারতীয় ছাত্রদের যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলে।

'পুশ্ দ্যাট্ ডার্টি নেটিভ আউট্,' উহাদের আরেকজন নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল।

তপন উহাদের গালাগালি করিতে নিষেধ করিল। প্রত্যক্ষই ইহার ফল পাওয়া গেল। প্রবল এক ধাক্কা আসিল পিছন হইতে।

কোনও মতে টাল্ সামলাইয়া পিছন ফিরিয়া তপনও ইহাদের অগ্রগামীকে এক পাল্টা ধাক্কা মারিল। এক মুহূর্ত্ত ইহারা হক্‌-চকাইয়া

গিয়াছিল, তারপর পিছন হইতে দলের তৃতীয় ছোক্‌রা আগাইয়া আসিয়া পলকে তপনের গালের উপর একখানা ঘুষি বসাইয়া দিয়া কহিল, 'ট্যাক্‌ ফর্‌ অ্যান্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ ডগ্‌ !'

'ইণ্ডিয়ান ডগ্‌ !' তপনের মাথার রক্ত ঠেলিয়া উঠিল। নিরীহ প্রকৃতির বালক আক্রমণকারীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ঘুষোঘুষি, আঁচড়ানো, কামড়ানোর এক দক্ষযজ্ঞ শুরু হইয়া গেল।

অনেক ছেলেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল। ইহাদের মধ্যে একজন তপনকে কাছের এক ডাক্তারখানায় লইয়া যায়। ছেলেটি পাঞ্জাবি, তপনের এক ক্লাস নিচে পড়ে। তপনকে সে চুপে চুপে বলে, 'এই ট্যাস্‌ ফিরিঙ্গীগুলো পাজির হাঁড়ি। দাঁড়াও না, আমরা স্বাধীন হয়ে নিই, তখন্‌ এরাই এসে আমাদের পা চাট্‌বে !'

পরাধীনতার প্রত্যক্ষ ফলাফল তপন এই অভিজ্ঞতা হইতেই সর্ব্বপ্রথম জানিতে পারে।

কিছুদিন হইল ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। অত্যন্ত খাটুনির ক্ষতিপূরণ হিসাবে এবার অখণ্ড ছুটি। কিন্তু তপনকে যথাসম্ভব কম পাড়ার ক্লাবে যাইতে দেন রাণীদেবী। একেবারে বাহিরের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে দিতে না হইলেই তিনি খুশি হইতেন। কিন্তু রায়-বাহাদুরই এতে ছেলেকে আস্কারা দেন। বলেন, 'টবের গাছ, টবের গাছই থাকে। সে বনস্পতি হ'তে পারে না। কিছুটা বাইরের হাওয়া লাগুক।' কাজেই রফা হইয়াছে, মাত্র খেলার নির্দ্দিষ্ট সময়ে তপন কাছের পার্কের ক্লাবে যোগ দিতে পারিবে।

বাকিটা সময় তার কাটে না। উমার ছুটির দিনে এই কাজের অভাব সে পোষাইয়া লয়। আজও পোষাইবার চেষ্টা করিতেছে।

এ দিকের পাঁচিলের কাছের বড়ো পেয়ারা গাছটা সম্প্রতি বড়ো বেশি নড়িতেছে। গাছের তলায় উমা শাড়ির আঁচল দিয়া কোঁচড় তৈয়ারি করিয়া উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে গাছের পত্রজালের দিকে তাকাইয়া আছে। অনেকক্ষণ ধরিয়াই তাকাইয়া আছে। ধৈর্য্য আর থাকে না। উদ্বেগ ও বিরক্তির লক্ষণ রৌদ্রে রাঙা মুখের উপর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

'ও দাদা, নেমে এসো। নেমে এসো বলছি।' অবশেষে সে হতাশ হইয়া কহিল। 'এতক্ষণে একটাও পেয়ারা দিতে পারলে না, করছ কি? খুব খাচ্চ বুঝি? শীগগির নেমে এসো। মা দেখলে বকে' একসা করবেন এখন…'

গাছের দুর্ভেদ্য অন্তরাল হইতে এইবার তপনের কণ্ঠ শোনা গেল। 'একসা করবেন না আরও কিছু। ম্যাট্রিক-দেওয়া ছেলেকে কেউ বকে! দেখিস, দু'মাস পরে যখন কলেজে ভর্ত্তি হবো, তখন প্রফেসারেরা পর্য্যন্ত বকতে সাহস করবেন না। খাতির করে' বলবেন, জেন্টেলম্যান্!…'

'বাঃ রে, তোমাকে বকবেন কেন,' উমা প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'তুমি মায়ের আহ্লাদে ছেলে! বকুনি খেতে আমি।… "তুইই ওকে নিয়ে গিয়েছিলি, নইলে তপন আমার তেমন ছেলে নয়! হাত-পা একখানা ওর ভেঙে না আনলে আর চলছে না।"…এসব তখন আমাকেই শুনতে হবে। লক্ষ্মী ভাই দাদা, এবার নেমে পড়…'

এই অনুরোধের ফল আশ্চর্য্য রকম দ্রুত ফলিল। গাছের উপর হইতে তপন দুম্ করিয়া নিচে লাফাইয়া পড়িল।

'চ' এবার। যা ভীতু তুই!'

'পেয়ারা কই ?' উমার চোখের দৃষ্টি জিজ্ঞাসাবোধক।

'জানি না।'

'তা বৈকি। ঐ তো পকেট ভর্ত্তি করে এনেচ। দাও, আমার আদ্দেক দিয়ে দাও, আধাআধি বখ্রা হয়েছিল, মনে আছে ?...'

'এই নে, লক্ষ্মী বোনটি।' বলিয়া পকেট হইতে একটা কালো পেয়ারার কড়া বাহির করিয়া তপন গম্ভীরভাবে উমার হাতে গুঁজিয়া দিল।

উমা একবার মাত্র চাহিয়া দেখিল। পরক্ষণে সে দূর করিয়া উহা ছুঁড়িয়া ফেলিল। সপ্রতিবাদে কহিল, 'দাও বলছি আমার ভাগ। অত চালাকি চলবে না...'

'পেয়ারা ছুঁড়ে ফেললি কেন ? দেব না, আর একটাও দেব না। দয়া করে দিই, আবার বখ্রাব কথা তুলছে !'

'ঈস্, দয়া না আরও কিছু।' উমা আপত্তি জানাইল। 'বখ্রা না করলে দুপুর রোদ্দুরে এখানে এসে মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থাকতে আমার বয়ে গিয়েছিল। যাও, চাইনে। তোমার সঙ্গে আড়ি। আর কক্ষণো তোমার সঙ্গে কথা...'

'তবে চব্বিশ ঘণ্টা বকর বকর চলবে কার সঙ্গে ?' তপন মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল।

'তার ঢের লোক আছে।' উমা কহিল। 'আর কেউ না থাকে, টেলিফোনে নীলার সঙ্গে কথা বলব।'

'সেও তো তোর সঙ্গে আড়ি করে দিয়েচে।' তপন একটা ডাঁসা পেয়ারায় কামড় দিয়া কহিল।

'হ্যাঁ, দিয়েচে, তোমাকে বলেচে !'

'তবে সে একমাস ধরে আসে না কেন ?'

'আসে না, বেশ করে।' উমা দালানের দিকে পা বাড়াইয়া কহিল, 'তাকে বিয়ে করতে চাও বুঝি!'

'দূর মুখপুড়ী!' উমার পিঠে এবার মৃদু কিল পড়িল। 'এই বখ্‌রা দিয়ে দিলাম। বাকি সব পেয়ারা এবার একা বসে খাব...

'খাও গে। ঐ শুনচ!' সহসা উমা একটা মোটরের হর্ণ-এর আওয়াজে কান খাড়া করিল।

'কি?'

'কি আবার! নীলাদের গাড়ির হর্ণ। কালই আমার সঙ্গে কথা হয়ে আছে। ভেবেছ, তোমার সঙ্গে গল্প করতে না পারলে মরে যাব। নীলা এসে গেছে, এবার তোমাকেই জব্দ করে ছাড়ব। নীলাকেও তোমার সঙ্গে কথা কইতে মানা করে' দেব।...'

'বড় ভয় পেয়ে গেলাম!' তপন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল। 'তোদের সঙ্গেই বরঞ্চ আমি কথা বলব না। বলতে হয় তোরা নিজেরাই সেধে এসে বলবি...'

উমা গাড়ি-বারান্দা লক্ষ্য করিয়া ইতিমধ্যেই ছুট্ লাগাইয়াছিল, বাঁ হাত উঁচু করিয়া বুড়ো আঙুল দেখাইয়া জানাইল, 'ঘোড়ার ডিম!'

উমা যখন গাড়ি-বারান্দায় উপস্থিত হইল, তখন মোটর ছাড়িয়া দিয়াছে। চলন্ত গাড়ির পেছনের কাচ দিয়া সম্ভ্রান্তদর্শন নীলার বাবা উমার উদ্দেশে ক'বার হাত নাড়িয়া বাগানের পথে অপসৃত হইলেন। উমা বুঝিল, নীলাকে নামাইয়া দিয়া তিনি কোর্টে ফিরিতেছেন। দুপুরের লাঞ্চ্ খাইতে প্রায়ই তিনি বাড়ি আসেন। হাইকোর্টে ফিরিবার পথে মাঝে মাঝে তিনি নীলাকে এখানে নামাইয়া দিয়া যান।

মহিম ব্যানার্জি বিখ্যাত ব্যারিস্টার। সারাক্ষণই তিনি ব্যস্ত থাকেন। নীলার মা নাই। বাড়িতে নিত্যসাথী হিসাবে এক ইংরেজ গবর্ণেস আছে, কিন্তু মাতৃস্নেহ ও সঙ্গ পাইতে হইলে নীলায় এ-বাড়িতেই আসিতে হয়। উমার সে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু।

ছুটিতে ছুটিতে উমা গাড়ি-বারান্দা ও সেখান হইতে লবিতে পৌঁছিয়া তবে বন্ধুর নাগাল পাইল। পেয়ারা গাছতলার ঠিকানা না জানায় নীলা দোতলার সিঁড়িতে পা দিয়াছিল। উমা পিছন হইতে আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

'এৎদিন আসিস্ নি কেন রে, মুখপুড়ী। আয়, ওপরে চলে আয়। দাদার সঙ্গে আড়ি করতে হবে।'

'তা খুব পারব।' নীলা অবিলম্বেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া কহিল। 'আড়ি করায় আমার জুড়ি নেই। কিন্তু আড়ি কেন ?... '

'পেয়ারার ভাগ নিয়ে ঝগড়া বেঁধেছে।' উমা কহিল।

'ঝগড়া বেঁধেচে তো কেড়ে নিলি না কেন ?' নীলা কহিল। 'চল না, কেড়ে নিই। দুজনের সঙ্গে আর পারতে হয় না...'

উমা কিন্তু নিজ অধিকার-স্থাপনের এমন অব্যর্থ উপায় অবলম্বনে বিশেষ উৎসাহ দেখাইল না। কহিল, 'তার চেয়ে গল্প করলে কাজ দেবে, চল। দেবেই তো। এখন শুধু শুধু খুনসুঁটি করচে। বেশির ভাগই দিয়ে দেবে। মিছিমিছি ঝগড়া করতে যাই কেন। কিন্তু আমরাও খুনসুঁটি করব। একটি কথাও বলব না, বুঝেচিস ?'

'খুব', নীলা সোৎসাহে কহিল। 'এমন ভাব করব যেন চিনিই না। কখনও দেখিই নি।'

সারাটা দুপুর ধরিয়া প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে এই বয়কট্ নীতির প্রয়োগ চলিল। তপন বার কয়েক আলাপ করিতে আসিয়া নাকাল হইল। উহারা তাকে মোটে আমলেই আনিল না।

'এরা সব কালা হয়ে গেচে।' তপন ইহাদের সান্নিধ্যে দেওয়াল-গুলিকে জানাইয়া দিল।

দেওয়াল বা অন্যেরা কোনও উচ্চবাচ্য করিল না।

'এদের নাক এখনই ছাদ ফুঁড়ে বেরুবে।' "ইহারা" কিন্তু শঙ্কিত হইল না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালু রাখিল।

'নিজেরা সেধে কথা না বললে কারুর সঙ্গেই আমি সেধে কথা বলি না।' অবশেষে পরাজিতের শেষ অস্ত্র বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তপন বিষয়ান্তরে মন দিল।

এই আড়ি-যুদ্ধের পরিণতি আসিল চমকপ্রদরূপে।

তখনও দুপুর আছে। লোকজনের সাড়াশব্দ নাই। এই অবসরে দুই সখী বাড়ী হইতে অন্তত এক বিঘা পরিমাণ বাগান ও ঝাড়ঝোপ পার হইয়া অর্কিডের ঘরের নিকটবর্ত্তী দোল্‌নার কাছে হাজির হইয়াছে। দুটি দোল্‌নায় দুজনে চড়িয়া বসিয়া দোল-খাওয়া শুরু করিয়াছে। একজন যখন এদিকে, অপর জন তখন অন্য দিকে উড্ডীন। রোদ নাই। গাছের ছায়ায় এ অঞ্চল অন্ধকার। গাছের ডাল ও ঝোপঝাড়ের ফাঁকে একবার বাড়িটাকে দেখা যায়, একবার দেখা যায় না।

সহসা নীলা কহিল, 'কি ছুঁড়চিস ?'

'ছুঁড়চি! কি ছুঁড়চি ?'

'তা বৈকি।' নীলা অপর প্রান্তের দশফুট শূন্য হইতে কহিল। 'খুব চালাকি হচ্ছে, না ?…'

পর পর ক'বারই তার মুখের উপর বেশ জোরে ছর্‌রার মতো, কিন্তু নরম নরম কুচিগুলি জোরে আসিয়া ঘা মারিতেছে।

'ওমা, এ কি।' সহসা উমাও চেঁচাইয়া উঠিল। 'খুব দুষ্টুমি হচ্ছে, বটে! নিজেই ছুঁড়ে মারচ, আর আমাকে বলচ...'

'ধ্যেৎ। এই যে আরেকটা! কি রে এগুলো!...' নীলা গালে আট্‌কাইয়া যাওয়া একটি ছর্‌রা তুলিয়া লইয়া কয়েকবার নাড়াচাড়া করিয়া সেটা জিবে ছোঁয়াইল। বিস্ময়-বিকৃত মুখে কহিল, 'বুঁদে! বুঁদে!'

'আমারও বুঁদে!' উমা বিস্ময়োক্তি করিল। 'ঐ দেখ, ঐ দেখ, নীলা। অর্কিডের ঐ ভূতের ঘরটার দিক থেকেই আসচে যে! উরে বাবা!...'

নীলা মাটিতে ব্রেক কষিয়া দোল্‌না থামাইল। কৌতূহলী দৃষ্টিতে লতার বেড়া-দেওয়া জালের ঘরটার দিকে চাহিয়া সকৌতুকে কহিল, 'ওর মধ্যে বুঁদের গাছ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, তা বৈকি! চলে আয় ভাই।' উমা দোল্‌না হইতে নামিয়া পড়িয়া সশঙ্ক কণ্ঠে কহিল। 'এ জায়গাটা ভালো নয়। মালীরা কি সব বলে। চল ভাই, এবার আমরা যাই·'

'কি বলে? ভূত?...'

উমা ভীতভাবে মুখের উপর আঙুল রাখিয়া ঐ নামটি উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিল।

নীলা দু'পা অর্কিডের ঘরের দিকে আগাইয়া গিয়াছিল। সেও পিছাইয়া আসিল। এতক্ষণ পরে সত্যই গা'টা ছম্‌ছম্‌ করিতেছে। কিন্তু ভয় পাইলেই নাকি ভূত আসিয়া ধরে। সাহস করিয়া আগাইয়া দেখিবে কি?

সহসা একটা সানুনাসিক শব্দ উদ্ভিদ-আচ্ছন্ন রহস্যময় ঘরটা হইতে ছিট্‌কাইয়া আসিল—যেন একটা হুলো বেড়াল রাগে গর্জ্জন করিয়া পিঠ বাঁকাইয়া আক্রমণ উদ্যত করিয়াছে।

আর এক মিনিটও দেরী হইল না। অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া দুই সখী যেদিকে পারিল দৌড় মারিল।

আরও একজন দৌড় মারিল। কিন্তু ঝোপজঙ্গলের আড়াল দিয়া। আপাদমস্তক কালো সাজ। হাতে গুল্‌তি ও বুঁদের ঠোঙা। বুঁদেগুলি এখনও গরম আছে, বাড়ির ওস্তাদ পাচক জগন্নাথ এগুলি বিকালের চায়ের উপসর্গ হিসাবে ভাজিতেছিল, তাহার কাছ হইতেই এগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে। কিন্তু দ্রুত ছুটিবার প্রয়োজনে শীঘ্রই বুঁদের ঠোঙা ও গুল্‌তিটি গাছের গুঁড়িতে বিসর্জ্জন দিয়া হাল্কা হইতে হইল।

তপনের ঘরের বাইরে ভীতকণ্ঠে 'দাদা, দাদা' ধ্বনি উঠিবার আগেই কিন্তু আল্‌পাকার গাউনটা আলমারিতে তুলিয়া ফেলা গেছে। হাতে বুঁদের রসের চিহ্নমাত্র নাই। যা ছিল সব চাটিয়া সাফ্।

'দাদা, শীগগির, শীগগির এসো···' দুই সখী উমা ও নীলা ভীত বিবর্ণ মুখে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকিয়াছে।

তপন নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, 'কি রে। শুধু শুধু চেঁচাচ্ছিস কেন ?···'

'ভূত !' উমা সাতঙ্কে কহিল।

'ভূত !' নীলা কোটালের কাছে নালিশ জানাইবার মতো করিয়া কহিল।

তপন ধীরে-সুস্থে হাই তুলিল। তার কোনই তাড়া নাই।

'ভূত, দাদা, ভূত !'

'ভূত !' নীলা কহিল। 'তাড়াতাড়ি আসুন না।'

'ভূত! দূর্।' এবার তপন তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিল। 'কোথায়?'

'বাগানে অর্কিডের ঘরে।' উভয় সখী ঐক্যতানে কহিল।

'বটে!' তপন বীরত্বের ভঙ্গিতে কহিল। 'চল দেখি, কেমন ভূত। কিন্তু ভূতের কাছে যাবার আগে একটা কথা মনে রেখো...'

'কি?'

'কি কথা?'

'দুজনেই', তপন গম্ভীর-মুখে কহিল, 'যেচে আমার সঙ্গে কথা বলচ!'

সাত

ম্যাট্রিকের ফল বাহির হইবার পর কি কান্নাটাই তপন কাঁদিল। মাত্র দুই নম্বরের জন্য সে জেনারেল স্কলারশিপ্ ফস্কাইয়াছে। এবার মাত্র দ্বিতীয় স্তরের বৃত্তি পাইবে। রাণীদেবী কত বুঝাইলেন। কহিলেন, 'এই বা কম কি?' কিন্তু তপন কিছুতেই সান্ত্বনা পাইল না।

তার প্রাইভেট-টিউটরেরা কহিলেন, 'বড় অল্প সময় পেয়েছিলাম, নইলে আরও ওপরে ঠেলতে পারতাম।... আমরা আই-এর ছেলেদেরও পড়িয়ে থাকি...'

তপন প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইল। জীবনের পরিধি যেন মন্ত্র-বলে বিস্তৃত হইয়া গেল। বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন জাতের নতুন নতুন ছেলের সঙ্গে চেনা হইল। নামকরা সব অধ্যাপকদের বক্তৃতা শুনিতে পাইল। নতুন নতুন পাঠ্য-বিষয়, নতুন নতুন বই, নতুন নতুন আলোচনা মনরাজ্যে তোলপাড় তুলিবার উপক্রম করিল। কত বড় লাইব্রেরী! কত বই! ডিবেটিং-ক্লাবে কত অদ্ভুত বিষয় লইয়া তর্ক! মাঝে মাঝে দেশবিখ্যাত লোকেরা আমন্ত্রিত হইয়া ছাত্রদের কাছে বক্তৃতা দিতেছেন। ছেলেরা নতুন নতুন বই পড়ার ও জ্ঞানলাভের প্রতি-যোগিতা করিতেছে। আজ কন্টিনেন্টাল সাহিত্য লইয়া মাতিয়াছে; কাল রবীন্দ্রনাথের নাটকের মহড়া চলিতেছে, পরশু হয়ত আর্ট-এগ্-জিবিশনের ব্যবস্থা হইতেছে। সিনেমা আর খেলাধূলার উৎসাহ তো আছেই। বাছবাছাইয়ের মতো রুচি এখনও তৈয়ারি হয় নাই; শুধু

বৃহত্তর মুক্ততর জীবনের যত আলো, যত শব্দ, যত গন্ধ হুড়মুড় করিয়া মনে ঢুকিতেছে। আশ্চর্য্য মাদকতা-ভরা এই কলেজ-জীবন!

ক'মাসের মধ্যেই তপন বন্ধুমহলে খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। ধনীর ছেলেরা কলেজের ক্লাসেও একটা অদৃশ্য দেওয়াল তুলিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। ইহা অপরদের মনে আঘাত করে। তপন প্রকাণ্ড মোটরে চড়িয়া কলেজে আসে, দামি জামা-কাপড় পরে; তার হাত-খরচের টাকার অঙ্কটা অন্যদের বিস্ময়োক্তির কারণ। কিন্তু এর কোনটাই তার বন্ধুপ্রীতি আটকাইতে পারে নাই। ক্লাসের সবচেয়ে গরীব ছাত্রের সঙ্গেও তার সমান ভাব।

বছর শেষ হইবার আগেই সে ডিবেটিং-ক্লাবের সহকারী সেক্রেটারি নিযুক্ত হইল। ইহাই তার বক্তৃতা দেওয়া শেখার প্রথম পাঠশালা। সুযোগটা সে দু'হাতেই গ্রহণ করিল।

পরের বছর সে কলেজ-য়ুনিয়নের কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইল। পড়াশুনার বাইরেও তার কাজের পরিমাণ বাড়িয়া চলিল।

এটি রাণীদেবী কিছুটা আশঙ্কার চোখে দেখিতেছেন। কলেজে যাইয়া বিদ্যালাভটা তিনি বুঝেন, কিন্তু তাহার ছেলে এতটা বাইরের ব্যাপারে মাতিয়া থাকিবে, এটা তার পছন্দ নয়। নিজের কাজ সারিয়া সে আসিয়া তাঁর পাশে বসুক, বাড়ির সকল বিষয়ে আরও বেশি উৎসাহ দেখাক, বাড়ির মানুষদের লইয়াই একান্তভাবে ব্যাপৃত থাকুক, তাঁর মায়ের মন অবচেতনভাবে ইহাই প্রত্যাশা করে। মাতামাতি করিয়া কোথায় আবার কোন্ অঘটন ঘটাইয়া বসিবে কে জানে।

পরের বৎসর তপনের বন্ধুরা তাকে য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের অন্যতম আণ্ডার-সেক্রেটারি হিসাবে নির্ব্বাচন করিয়া বসিল। খবরটি শেষ পর্য্যন্ত ও তপনের কাছে গোপন ছিল। অসুখের জন্য প্রায় দুই সপ্তাহ

সে কলেজে অনুপস্থিত ছিল, এই সুযোগেই বন্ধুরা তাহার স্বপক্ষে ক্যান্‌ভাসিং সারিয়া লইয়াছে। যেদিন নির্ব্বাচনের ফলাফল বাহির হইল, সেদিন তপন পর্য্যন্ত অবাক।

এই নির্ব্বাচন ছাত্র-সমাজে জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্বের নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত হয়। তপন প্রথমে বন্ধুদের এই তামাসায় রাগ করিয়াছিল, কিন্তু মনে মনে বেশ একটু খুসিও হইল। বাড়ি আসিয়া সগর্ব্বেই সে খবরটা জানায়।

'তুই দাঁড়াচ্ছিস বলে কই আমাকে তো বলিস্ নি!' রাণী সামান্য ক্ষুণ্ণভাবে মন্তব্য করিলেন।

'আমি তো নিজেও জানতুম না, মা।' তপন কহিল। 'আমাকে না জিজ্ঞেস করেই আমার অসুখের মধ্যে ওরা এসব কাজ করে ফেলেচে...'

'তা যা হয়েচে, হয়েচে। এখন ছেড়ে দিলেই হবে। ওসব হৈচৈ-এর মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। ওতে পড়াশুনোয় ক্ষতি হয়...'

তপন বেশ একটু হতাশ হইল। পড়াশুনায় এমন কিছু ক্ষতি হইত না। বরঞ্চ, দেশের নামকরা লোকদের সঙ্গে জানাশোনা হইত, ছাত্র-জগতে প্রতিষ্ঠা হইত। কিন্তু তপন বুঝিল, ইহা মায়ের পছন্দ নয়।

পরদিনই সে বন্ধুমহলে তার পদত্যাগ ঘোষণা করিল। দারুণ আপত্তি উঠিল চারদিক হইতে। টীকা-টিপ্পনীও কম হইল না।

'ইন্‌ষ্টিটিউট তো কংগ্রেস না, তবে আর রায়বাহাদুরের আপত্তি কেন?' পিছন হইতে একজন সব্যঙ্গে কহিল।

তপন একবার তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে ছেলেটার দিকে তাকাইল মাত্র, কিছুই বলিল না।

বন্ধু সমীর তপনের অন্যতম প্রধান সমর্থক ছিল। সেই এইবার

তপনকে লইয়া পড়িল। কিন্তু পদত্যাগ প্রত্যাহার করিতে কিছুতেই তাকে রাজি করান গেল না।

'ব্যাপারটা কি বলত, তপন ?'

'ব্যাপার আবার কি। এটা মায়ের বেশি পছন্দ নয়, ব্যাপার এইটুকুই।'

'কেন, বখে যাবি ভয়ে ?'

'অসম্ভব কি।'

'চল্ না, আমি একবার বলে দেখি।' সমর কহিল।

'থাক্, ভাই। জীবনে মস্ত ঘা খেয়েচেন। অবাধ্য হয়ে তাঁর ব্যথাটা আর নাই-বা বাড়ালাম।'

সমর বাধ্যতাকে মূল্যবান মনে করে না। সে ক্ষণকাল বিস্মিতভাবে তপনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবি নে তো ?...'

'এত বিনয় কেন ? জিজ্ঞেস করলেই হয়।' তপন তার জিজ্ঞাসু চোখ তুলিয়া চাহিল।

'আমাদের এক আত্মীয়,' সমর সামান্য দ্বিধার কণ্ঠে কহিল, 'একদিন তোর বাবার কথা তুলেছিলেন।...আচ্ছা, ইনি কি তোর নিজের মা নন ?...'

'এটুকুও', তপন অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া কহিল, 'তোর সেই আত্মীয়টিকে জিজ্ঞেস করে' নিলেই পারিস।'

প্রায় আহতভাবে তপন সরিয়া গেল।

রাণীদেবীর ইচ্ছার সম্মানে তপন তাহার স্বাভাবিক বহু আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিয়াছে। রাজনীতি হইতেও সে যথাসম্ভব সরিয়া থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ইহার আকর্ষণ সম্পূর্ণভাবে এড়াইতে পারে

নাই। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনে ১৯৪৬ সাল এমন একটি সময় যখন শিক্ষিত লোক তো দূরের কথা, একজন অশিক্ষিত ভারতীয়ের পক্ষেও রাজনীতির দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল গতি ও ঘটনার প্রতি চোখ বন্ধ করিয়া রাখা অসম্ভব ছিল।

তপন আগামী বার বি-এ দিবে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন যে, ছাত্রদের পক্ষেও পরীক্ষা-পাস একটা গৌণ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজ এবার ভারত ছাড়িবে কি?—চতুর্দ্দিকে বিক্ষুব্ধ ভারতবাসীর ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদী ফৌজ আসাম-সীমান্তে পরাজিত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্রোহ আসিয়া পৌছিয়াছে সুভাষচন্দ্রের জন্মস্থানে, ভারতবাসীর হৃদয়াভ্যন্তরে। কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন এবং সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র আন্দোলন কলিকাতায় জড়াজড়ি শুরু করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হৃতবল ব্রিটেন বিদ্রোহী ভারতবর্ষকে পরাধীন রাখার ক্ষমতা সম্বন্ধে নিজেই সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় চার্চ্চিল-মন্ত্রীসভার পতন ঘটিল। ভূয়া মর্য্যাদার খাতিরে চার্চ্চিল ভারতকে দাবাইয়া রাখিতে আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতেন। কিন্তু এই চেষ্টার ব্যর্থতা সম্বন্ধে প্রগতিশীল শ্রমিক মন্ত্রীসভার সন্দেহ ছিল না।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের এই সন্ধিক্ষণে অধৈর্য্য ভারতের বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিল সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায়। আর ইহাতে প্রধান অংশ নিল ছাত্রেরা। রাজনৈতিক দাঙ্গার অগ্নুদ্গার শুরু হইল। পুলিশের গুলিকে আর লোকে ভয় করে না, মিলিটারির সাঁজোয়া-বাহিনীর সামনে বুক পাতিয়া দেয়। ঢিল ছুঁড়িয়া, মিলিটারি ট্রাক্ পোড়াইয়া, রাস্তায় ব্যারিকেড্ তুলিয়া ইংরেজ-সরকারের অন্তিম নাভিশ্বাস তোলাইয়া ছাড়ে।

ইহার পর কলিকাতার বিদ্রোহ বোম্বাইয়ে ছড়াইয়া পড়ে, অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। ভয়ঙ্কর বিক্ষোভে গভর্ণমেণ্ট অচল হইয়া উঠিবার উপক্রম হয়।

এই 'সশস্ত্র' প্রতিবাদেই যে বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সেদিন সন্ধ্যার পর রায়বাহাদুর প্রতাপ মুখুজ্জে তাহার বাড়ির নিজস্ব অফিস-কাম্‌রায় দরকারি কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। এমন সময় মালী আসিয়া খবর দিল, 'থানার দারোগাবাবু দেখা করতে এসেচেন হুজুরের সঙ্গে।'

রায়বাহাদুর সবিস্ময়ে চোখ তুলিলেন। এক সেকেণ্ড নীরব থাকিয়া কহিলেন. 'এইখানে নিয়ে আয়।'

দারোগাবাবু আসিয়া সসম্ভ্রমে স্যালুট্ করিলেন।

'বসুন।' রায়বাহাদুর কহিলেন। 'কোনও দরকার আছে কি?'

'হ্যাঁ, স্যার, একটু দরকার আছে।' দারোগা সামনের চেয়ারে আসীন হইয়া কহিলেন। 'এ সময়েই আপনাকে ধরা সুবিধে ভেবে সকালের দিকে আর আসিনি। আপনার বাড়িতে তপন মুখুজ্জে বলে একটি ছেলে থাকে?'

'হ্যাঁ, কেন? আমার ছেলে, পালিত-পুত্র।' রায়বাহাদুর উদ্বিগ্নদৃষ্টিতে তাকাইলেন।

'আপনি শুনেচেন নিশ্চয়, গত ক'দিন পদ্মপুকুরের সামনে গোটা কয়েক মিলিটারি লরিতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েচে। পাড়ার বখা ছেলেদের কাণ্ড। আমাদের ইন্‌ফরমেশন হচ্ছে, তপন মুখুজ্জে এদের দলের একজন রিং-লীডার। ক'জনকে এরই মধ্যে আমরা

অ্যারেস্ট করেছি। এ ছেলেটি আপনার ছেলে বলে এখনও অ্যারেস্ট করিনি। ভাবলাম, আপনাকে বলে যাই। একদম বাঁদর হয়ে উঠেছে ছেলেপেলেগুলি ..'

'তপন তো ঠিক সে রকম নয়।' রায়বাহাদুর বিপন্নভাবে কহিলেন। 'আপনারা ভুল খবর পাননি তো? মানে…'

'খবর আমরা ঠিকই পাই।' দারোগা ভারিক্কি চালে কহিলেন। 'গার্জিয়ানেরা বাড়ির ছেলেপেলেদের উপর উচিতমত দৃষ্টি রাখেন না বলেই এত সব হাঙ্গামা!...এই দেখুন না আমার ফাইলটা।' বলিয়া দারোগাবাবু সঙ্গের লাল-ফিতায় বাঁধা ফাইলগুলির একটি ফিতা খুলিতে শুরু করিলেন।

'তার দরকার নেই।' রায়বাহাদুর কহিলেন। 'আমি ওকে ডেকে সাবধান করে দেব।…'

'হ্যাঁ, তাই দেবেন।' দারোগা ফাইল বন্ধ রাখিয়া কহিলেন। 'আপনাদের সব বাড়ির ছেলেপেলেদের তো এসব করার কথা নয়। এসব বদ ছোক্‌রাদের সঙ্গে মেশার ফল। ডেকে একবার ধমকে দেবেন।…আচ্ছা উঠি, স্যার। আরও তিন জায়গায় যেতে হবে। খেটে খেটে একেবারে হয়রাণ!'

দারোগাবাবু ক্লান্তভাবে উঠিয়া পড়িলেন।

তপনের ডাক পড়িল রাণীদেবীর কাছে।

'হ্যাঁ রে, এ কি শুনছি? যারা মিলিটারি লরি পুড়িয়ে দিচ্ছে, তুই নাকি তাদের দলে আছিস? এই মাত্র থানা থেকে দারোগা এসেছিল। বল, সত্যি করে বল? মার কাছে মিথ্যে বলতে নেই…'

'হ্যাঁ, আছি।' তপন গম্ভীরভাবে কহিল।

'আছিস!' রাণীদেবী প্রায় আহত হইয়া কহিলেন। 'ছোটলোকের সঙ্গে মিশে তুই লরি পোড়াচ্ছিস, ঢিল ছুঁড়চিস, এ-ও আমাকে শুনতে হচ্চে! এসব যে ইতরে করে। শেষে তুই-ও ইতরামি করবি…'

'ইতরামি নয়, মা। এটা যুদ্ধ; গেরিলা যুদ্ধ।' তপন কহিল। 'বিদেশী শাসককে যেমন করেই হোক তাড়াতে হবে। এখন সুযোগ এসেছে। এদের জীবন সকল রকমে অতিষ্ঠ করে' তোলা গেলে এবার ওরা নিশ্চয়ই তল্পিতল্পা গুটোবে।'

'যদি গুলি খাস্!' সভয়ে রাণী কহিলেন।

'কত লোকই তো ওদের গুলিতে মরচে। যুদ্ধ করতে গেলে গুলির ভয় করা চলবে না। শুধু কি গুলি। দেখ না, গোরা সৈন্তরা বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে রাস্তার কত লোক চাপা দিয়ে শেষ করচে। পদ্মপুকুরের বস্তির তিন তিনটে বাচ্চা ছেলে চাপা পড়ে মরেচে গত দুদিনে। তাই তো লরি-পোড়ানো শুরু হয়েচে। চুপ করে লোকে মরবে কেন? এবার তারাও উল্টো আক্রমণ করচে। তার ফল দেখচ তো। বেপরোয়া গাড়ি-চালানো কমে গিয়েচে আশ্চর্য্য রকম।…'

'তুই নিজে গাড়িতে আগুন দিয়েচিস?' রাণী স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন।

'নিজ হাতে দিই নি।' তপন কহিল। 'তার জন্ম অন্ত লোক আছে। আমাদের গেরিলা ইউনিট গঠন করতে হয়। তার জন্ত টাকা দিতে হয় আমাকেই।…আর কারুর তো টাকা নেই…'

'তা বেশ। যা টাকার দরকার চুপে চুপে আমিই দেব।' রাণী, নিরুপায়ভাবে কহিলেন। 'কিন্তু দলে মেশা কিছুতেই চলবে না বলে

দিলুম। যা করতে হয়, আড়াল থেকেই করতে হবে, এ কথা যেন মনে থাকে…'

রায়বাহাদুর-গৃহিণী ইংরেজের খেতাবের ঋণ যথাযথভাবেই পরিশোধ করিলেন!

ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন হইল।

আট

কার্পেট-মোড়া চওড়া সিঁড়িগুলি দিয়া নীলা প্রায় নাচিতে নাচিতে উপরে উঠিয়া গেল।

দোতলার লবিতে পৌঁছাইয়া ডান দিকেই বাবার লাইব্রেরী। অন্ত কোনও দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া নীলা ভিতরে প্রবেশ করিল।

যেন এক বইয়ের অরণ্যে প্রবেশ করিল। বিচিত্র ও অসংখ্য বইয়ের আলমারি নানা সারিতে বিভক্ত। র‍্যাকের পর র‍্যাক বই দেওয়ালের দিকে পিঠ দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। অধিকাংশই আইনের বই, ল'রিপোর্ট—কৃতী ব্যারিস্টারের অপরিহার্য্য সঙ্গী। কিন্তু ইহা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকারের বই গৃহস্বামীর জ্ঞানস্পৃহার পরিচয় দেয়। প্রকাণ্ড ঘরটা শুধু বই ও বইয়ের আব্‌হাওয়ায় ভরা।

এই পুস্তক-অরণ্যের এক পরিষ্কার অংশে উঁচু ল্যাম্প-স্ট্যাণ্ডের তলায় কালো রেক্সিনে মোড়া ইজিচেয়ারে ব্যানার্জ্জি-সাহেব চোখের পুরু চশমা বইয়ের পাতায় নিবদ্ধ করিয়া তপোবনের ঋষির মতো প্রশান্ত মূর্ত্তিতে পাঠমগ্ন আছেন। পাশেই নিচু তেপায়াতে তাঁর চশমার খাপ, টুব্যাকোর টিন, কাগজ ও ফাউণ্টেন পেন। পাইপের ধোঁয়া উঠিতেছে মুখ হইতে।

নীলা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বাবার এই তন্ময়-মূর্ত্তির দিকে চাহিল। তার সারাটা মুখ খুশিতে দীপ্ত হইয়া উঠিল। পা টিপিয়া টিপিয়া সে একেবারে কাছে আগাইয়া আসিল।

'বাবা!'

ব্যানার্জ্জি-সাহেব চমকাইয়া চাহিলেন। সকৌতুক কণ্ঠে কহিলেন, 'আরে দুষ্টু মেয়ে, চুপে চুপে কখন এসে হাজির হয়েচিস? আমি সেই কখন থেকে কান খাড়া রেখেছি। বল, এবার কি সব করেচিস? খুব আনন্দ করেচিস তো ..'

নীলা বাবার চেয়ারের হাতলে বসিয়া তাঁর গলা জড়াইয়া আদর করিয়া খুশির কণ্ঠে কহিল, 'হ্যাঁ, বাবা, খুব আনন্দ করে এলাম। কত আমি হাততালি পেয়েছি নাচের জন্য। তুমি থাকলে কি আনন্দই হতো। তুমি বলেচ বলেই তো নাচতে রাজি হলাম, নইলে এত বড় ধাড়ী মেয়ে কখনও নাচে...'

'খুব ধাড়ী মেয়ে হয়েচিস, না রে!' ব্যানার্জ্জি-সাহেব সকৌতুকে কহিলেন।

'নয় বুঝি? আর ক'মাস গেলেই ফার্স্ট ইয়ার ছাড়িয়ে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠব। আমি বুঝি এখন কম বড়ো...'

ব্যানার্জ্জি-সাহেব কহিলেন, 'তা বৈ কি। মস্ত বড় হয়েচিস। এবার তোর বিয়ে দিতে হবে...'

'যাও।' বলিয়া কৃত্রিম অভিমানে নীলা চেয়ারের হাতল ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিপত্নীক ব্যানার্জ্জি-সাহেবের এক মাত্র স্নেহের পাত্রী তার মেয়ে অনিলা। এই নীলা তার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গী। এদের গানের প্রতিষ্ঠানে আজ বাৎসরিক উৎসব ছিল। প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধেই তিনি অনিচ্ছুক কন্যাকে নাচিতে রাজি করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্ত্তে জরুরি কাজে আটকাইয়া গিয়া এই উৎসবে নিজে হাজির হইতে পারেন নাই। বন্ধু উমা আসিয়া নীলাকে লইয়া যায়। তাহাদের গাড়িতেই বাড়ি পৌছাইয়া দিয়া গেছে।

'তোর কাকীমা গিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, বাবা। কাকীমা, উমার দাদা, উমা। খুব আজ আনন্দ করেচি। যা হেসেচি, বাবা...'

'তবে যা। এবার গিয়ে মিসেস্ পার্কিংটনকে একটু ভরসা দিয়ে আয়।' ব্যানার্জ্জি-সাহেব কহিলেন। 'তোর দেরি দেখে সে বেচারি উদ্বেগে একশেষ...'

'উঃ, কেন যে তুমি বুড়িটাকে বিদায় কর না,' নীলা কৃত্রিম অধৈর্য্যের সঙ্গে কহিল। 'এখনও কি আমি খুকিটি আছি যে গবর্ণেস চাই ? দেশ স্বাধীন হয়েচে, ইংরেজ দূর হয়েচে, তবে আর ইংরেজের এতটুকু বাকি থাকে কেন ?...'

'দূর পাগ্‌লী। তোর মায়ের কাল থেকেই যে আছে, দেশ স্বাধীন হয়েচে বলে কি তাকে দূর করা যায় ? বেচারি নীলা বলতে অজ্ঞান...'

'তা বৈ কি। সারাক্ষণ উপদেশ দিয়ে দিয়ে আমার মাথা ধরিয়ে দেয়।' নীলা কৃত্রিম প্রতিবাদ করিয়া কহিল। 'যাই, আর এক প্রস্ত কৈফিয়ৎ দিই গিয়ে...'

'তাই যা মা।' ব্যানার্জ্জি-সাহেব কহিলেন। 'আমি একটু পড়ছি। খাওয়ার সময় হলেই আমাকে ডেকে নিস্।...সাড়ে আটটা, উঁ ?...'

'না, ঘড়ির কাঁটাকে সেলাম করে খাওয়া চলবে না।' যাইতে উদ্যত হইয়া সহসা থামিয়া পড়িয়া নীলা দুষ্টুমির সুরে কহিল। 'আজ খাওয়া আটটা একত্রিশে ..'

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নীলা ছুট্ লাগাইল।

লবিতে বাহির হইয়া আসিয়া নীলা আগের মতোই নাচিতে নাচিতে, গানের কলি ভাঁজিতে ভাঁজিতে মিসেস্ পার্কিংটনের খোঁজে চলিল। আশৈশব এই ইংরেজ মহিলা তাহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন। বয়োবৃদ্ধির

সঙ্গে নীলা যতই ইহার অবাধ্য হইতেছে, ততই ভদ্রমহিলা তাহার উন্নতির জন্য উদ্বিগ্ন চেষ্টার মাত্রা বাড়াইয়া দিতেছেন। কলেজে-পড়া নীলার সঙ্গে কিছুতেই আর আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

'উ মা!' বলিয়া নীলা সহসা চমকাইয়া উঠিল। দেখিল, তাহার হাতের সামনে প্যাকিং কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট। এইবার নীলা কাছে তাকাইয়া দেখিল।

বারান্দায় এক কোণায় বাড়ির সরকার প্যাঁচাবাবুর দপ্তর। বেঁটে, নীরব, দার্শনিক টাইপের লোকটি। পঞ্চাশ বছর বয়সেও চুল পাকে নাই, কিন্তু চাল-চলনে সত্তর বছরের উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য আসিয়া গেছে। দাড়ি নেই, গোঁফের বিস্তৃতি একটু বেশি। ইহার প্রত্যন্ত ভাগ ঠোঁটের কাছ দিয়া ঢালু হইয়া পড়িয়াছে। এমন নির্ভরযোগ্য বিবেচক লোকের মন্ত্রী হওয়া উচিত ছিল। এমন নীরব কর্ম্মী প্রকৃতই বিরল। নীরবে সমস্ত কাজ করিয়া যান, কিন্তু মুখ দিয়া তিনি কদাচ একটি কথাও উচ্চারণ করেন না।

'কি এটা?' প্যাঁচাবাবুর প্রসারিত হাত হইতে প্যাকেটটা গ্রহণ করিয়া নীলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু নিরর্থক জবাবের অপেক্ষা করিল না, নিজেই উহা খুলিয়া লইল।

'ওঃ, ব্লাউজ পিস্‌টা।' সহর্ষে সে কহিল। 'গুড.! আমি তো ভুলেই গিছলাম। কিন্তু কই, কালকে যে চুল ধোয়ার লোশনটা আনতে বলেছিলাম, সেটার কি হলো?...'

প্যাঁচাবাবু ইহারও কোনও জবাব দিলেন না। নীরবে তাহার দপ্তরখানার অন্তর্গত একটি ড্রয়ার খুলিয়া লোশনের শিশি বাহির করিয়া আনিলেন।

'গুড্, গুড্!' শিশি হাতে লইয়া তাহা নাড়িয়া চাড়িয়া নীলা খুশির

সঙ্গে কহিল। 'ঠিক জিনিষটি আনতে পেরেচেন। কেবল কথা বলবেন না, ঐ আপনার দোষ; নইলে সব কিছু পারেন।...এক উলের কাঁটা-গুলো এখনও আনতে পারেন নি, এক হপ্তা আগে বলেছিলাম বা দুদিন আগেও হতে পারে...'

প্যাচাবাবুর নীরবতা অক্ষুণ্ণ রহিল, কিন্তু তাহার একটি হাত অন্য একটি ড্রয়ারে প্রবেশ করিয়া ছোট বড় নানা আকার ও রঙের কয় জোড়া বুনিবার কাঁটা বাহির করিয়া আনিল।

'তাও এনেচেন!' নীলা খুশি-মেশান বিস্ময়ে চেঁচাইয়া উঠিল। 'আশ্চর্য্য লোক! অথচ মুখে একটি কথাও বলবেন না...'

প্যাচাবাবু কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। তাঁহার ঠোঁট পূর্ব্বের মতই বন্ধ রহিল। শুধু চোখের কাছাকাছি দু'চারটি কুঞ্চন-রেখা জাগিয়া উঠিয়া জানাইয়া দিল, কর্ত্তৃপক্ষের এই প্রশংসাবাদ তিনি সাদরেই গ্রহণ করিয়াছেন।

'মিসেস্ পার্কিংটন, মিসেস্ পার্কিংটন', বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে নীলা ব্যস্তভাবে উপরতলার ড্রইং-রুমে আসিয়া ঢুকিল। এখানেও তাকে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হইল। অধৈর্য্য কণ্ঠে কহিল, 'কোথায় গেল ঐ জুজুবুড়িটা ছাই! মিসেস্ পার্-কিং-টন...'

পিয়ানোর সামনে মখমলের টুলটায় বসিয়া অতিকায় বাদ্যযন্ত্রটার রীড্ চাপিয়া সে একটা বিজড়িত আর্ত্তনাদ তুলিতে সমর্থ হইল—স্বরহীন মিষ্টত্বের একটা অন্ধ উচ্ছ্বাস।

এইবার মিসেস্ পার্কিংটন তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। ঈষৎ তিরস্কারের সুরে কহিলেন, 'হোয়ট্, ইউ হেয়ার, এণ্ড আপ্ টু ইওর প্র্যাংক্‌স্ আগেইন!'

পিয়ানোর ঘাট্ হইতে হাত তুলিয়া তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া নীলা

কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গিতে কহিল, 'ইংরেজি চলবে না! নো! পার তো বাংলায় যা বলবার বলো, বিশুদ্ধ বাংলায়…'

'ডোণ্ট্ বি অ্যাব্সার্ড, ডার্লিং!' বৃদ্ধা কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিলেন।

'হ্যাঁ, আমি অ্যাব্সার্ড বৈকি!' নীলা দুষ্টুমি করিয়া কহিল। 'তুমি এৎদিন এ দেশে আছ, বাংলা বলতে পারবে না, আর আমি তোমাদের দেশটা মাত্র ম্যাপে দেখেছি, এই অপরাধে আমাকে ইংরেজি বলতে হবে! স্বাধীন ভারতে উটি চলবে না, মাই ডিয়ার জুজুবুড়ি…'

মিসেস্ পার্কিংটন সহাস্যমুখে কহিলেন, 'টুমি ভারি ডুষ্ট মেয়ে…

নীলা এইবার টুল হইতে লাফাইয়া উঠিল। মিসেস্ পার্কিংটনকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'ওয়ান্ডারফুল! এত উৎকৃষ্ট বাংলা উচ্চারণ শুনলে কে না মুগ্ধ হবে! নাও, একটু বাজাও দেখি। নো লেসন্স, প্লিজ! আনন্দ দেবার জন্য অন্তত একদিন বাজাও…' বলিয়া বৃদ্ধাকে সে পিয়ানোর টুলে বসাইয়া দিল।

'নাও, শুরু কর।' কাছে দাঁড়াইয়া সে কৃত্রিম হুকুমের স্বরে কহিল।

বৃদ্ধা শুরু করিলেন। কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিলেন না। নীলা তাহার হাত এক ঝট্কায় রীডের উপর হইতে সরাইয়া দিল। কহিল, 'উহু, উটি চলবে না। আজ দিশী সুর চাই। ওসব ইকির-মিকির আজ অসহ্য…পুরিয়া জানো, বা জয়জয়ন্তী, যার সুরে সুরে বাগানে ফুল ফুটে উঠবে…'

'ওহ, নীলা!' মিসেস্ পার্কিংটন প্রতিবাদের সুরে কহিলেন।

নীলা সদয় হইল। কহিল, 'তবে সরো, আজ আমাকেই বাজাতে দাও।...কি শুনবে বলো তো?' বলিয়া মিসেস্ পার্কিংটনের পরিত্যক্ত আসনে বসিয়া পিয়ানোর ঘাট্ টিপিয়া খুশি-ভরা গলায় গান শুরু করিল :

"দ্বারে কেন দিলে নাড়া, ওগো মালিনী,
কার কাছে পাবে সাড়া, ওগো মালিনী।"

নয়

য়ুনিভার্সিটির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাস ভাঙিয়াছে। দলে দলে ছাত্র সিনেট হল ও আশুতোষ বিল্ডিংসের মধ্যবর্ত্তী গেট দিয়া কলেজ স্ট্রীটে বাহির হইয়া আসিতেছে। দু'চারটি ছাত্রীও আছে।

এই ভিড়ের মধ্যে তপনও ছিল। পিছন হইতে বন্ধু সমর কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিল, 'মিটিং আছে, মনে আছে ?'

'আছে।'

'তবে চল্।'

কলেজ স্কোয়ারের ভিতর দিয়া উহারা মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের দিকে আগাইয়া গেল।

তপনের এবার এম, এ-র শেষ বছর। বি-এ পরীক্ষায় ইতিহাসে সে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইয়া রাণী দেবীকে হর্ষিত করিয়াছে। ভালো ছাত্র হিসাবে অধ্যাপক-মহলে তার নাম হইয়াছে।

দুই বন্ধু যখন যুব-সমিতির অফিসে উপস্থিত হইল, তখন মন্ত্রণা-পরিষদের মিটিং শুরু হইয়া গিয়াছে। নীরবে তাহারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করিল।

সভাপতি ত্রিগুণাবাবু টেবিলের একপ্রান্তের চেয়ার হইতে এক ডজনের অনধিক সদস্যের কাছে ঘরোয়া স্বরে কথা বলিতেছিলেন। কংগ্রেসের পুরাতন কর্ম্মী, দীর্ঘ কারাবাস এবং কষ্টভোগের ছাপ সারা দেহে। শীর্ণ কঠিন শরীর, শক্ত হাতের মুঠো, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ-উজ্জ্বল, মুখে দৃঢ়তার চিহ্ন।

'দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই আমাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করতে হবে, এ যুক্তি আমি মানি নে।' তিনি সম্ভবত কোনও প্রতিবাদকারীর যুক্তি-খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই বলিলেন। 'ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ইটার্নেল্ ভিজিলেন্স্ ইজ্ দা প্রাইস্ অব্ লিবার্টি! সতর্ক হয়ে সব সময়ে স্বাধীনতাকে পাহারা দিতে হয়, নইলে যে কোনও সময়ে তা বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে।···আমি শুধু বৈদেশিক আক্রমণের কথা বলছি না, আভ্যন্তরীণ গোলযোগের কথা বলছি না, ভয় আছে কর্ত্তা-ব্যক্তিদের কাছ থেকেও। ·'

'এটা বুঝলাম না, ত্রিগুণাদা,' শ্রোতাদের মধ্য হইতে একটি যুবক বলিল। 'আমাদের নেতাদের এতকাল আমরা অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করেছি, তাদের আদর্শবাদ সর্ব্বজনবিদিত, তবে তারা গবর্ণমেণ্ট গঠন করেছেন বলেই তাদের প্রত্যেকটা আচরণে সন্দেহ করতে থাকব কেন ?···'

'সন্দেহ করতেই হবে, এমন বলছি না,' ত্রিগুণাবাবু উহার দিকে চাহিয়া বলিলেন। 'কিন্তু সতর্ক হয়ে থাকা উচিত নয় কি ? ক্ষমতা লোকের চরিত্র নষ্ট করে। যে ভদ্র ছিল, সে রূঢ় হয়ে ওঠে; যে জনসাধারণের বন্ধু ছিল, সে ক্ষমতাবানদের বন্ধু হতে চায়। যে-চোখ দিয়ে সে জনতার দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করত, সে-চোখ হারিয়ে বসে সে ত্রুটি অমার্জ্জনীয় মনে করে। হুকুমটাকে সবচেয়ে বড়ো জিনিস বিবেচনা করে। নিজের দোষ দেখতে পায় না। কেউ যদি তার অক্ষমতার দিকে আঙুল দেখায়, তবে সেই আঙুলটা ভেঙে দেবার দিকেই তার সকল শক্তি নিয়োজিত হয়। ঠিক এই জন্যই গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে বিপক্ষ-দলকে এতটা অপরিহার্য্য মনে করা হয়ে থাকে···'

ছেলেটির দ্বিধা দূর হইল না। কহিল, 'আপনি সাম্প্রতিক কতগুলি ঘটনা লক্ষ্য করেই এসব কথা বলচেন। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের মতো

শিশু-রাষ্ট্রকে বিপন্ন করবার জন্য যদি দলবদ্ধভাবে চেষ্টা হয়, তবে গবর্ণমেণ্টের কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা কি অন্যায় ?…'

'না, আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা অন্যায় নয়।' ত্রিগুণাবাবু প্রশান্ত মুখে অনুত্তেজিত ভাবে কহিলেন। 'সেটা গবর্ণমেণ্টের ন্যূনতম অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু সেটাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান আদর্শ হতে পারে না। প্রজার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানই গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। দু'চার জন লোক ধনী হবে, দু'দশ গণ্ডা লোক বড় চাকরি পাবে, বা দু'দশ জনে মন্ত্রী হয়ে ইংরেজরা যে ক্ষমতা খাটাতো মনের সুখে সেই ক্ষমতা খাটিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করবে, তা কখনও আদর্শ হতে পারে না। চারদিকে দারিদ্র্য, অভাব, খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব…'

'একটা শিশু-রাষ্ট্রের পক্ষে কি রাতারাতি এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব ?' প্রতিবাদকারী কহিল।

'সম্ভব নয়।' ত্রিগুণাবাবু এবারও তাহার কথা মানিয়া লইলেন। 'আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যে পথে আমরা চলছি, সে পথে এই অভাবের সমস্যার পূর্ণ সমাধান অসম্ভব। শুধু রাজনৈতিক ডেমোক্রেসিতে অগণিত জনতার দুঃখ দূর হবে না ; তাদের হিতের জন্য অর্থনৈতিক ডেমোক্রেসিও অত্যাবশ্যক। মিলের উৎপাদন বাড়াতে হবে, এটা ঠিক। কিন্তু এই উৎপাদনের মুনাফার বেশির ভাগ যদি মিল-মালিক আর পেটোয়া ব্ল্যাকমার্কেটারদের পকেটে যায় তবে সাধারণ লোকের কি সুবিধা হবে ? দেশের কয়েকজন অত্যন্ত অসভ্য রকম ধনী ; অধিকাংশ লজ্জাকর রকম দরিদ্র। এই গোড়ার সমস্যার সমাধান করতে না পারলে অন্য সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভব নয়। এখন আমরা ইংরেজ-শাসনের অনুবৃত্তিই চারদিকে দেখতে পাচ্ছি। এর বিপরীত জনমত আমাদের তৈরি করতে হবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অতি-বৈষম্যের

অবসান, প্রধান প্রধান শিল্পগুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে' তার মুনাফা জাতীয় সরকারের হাতে আনা— যা ব্রিটেনে এখন সাফল্যের সঙ্গে করা হচ্চে—তার জন্য আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। আমাদের নেতারা যেন গদির আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে না পড়েন...'

তিনি এক সেকেণ্ড নীরব রহিলেন। তারপর কহিলেন, 'তোমাদের কারুর কি শহরের বস্তি সম্বন্ধে নিজস্ব কোনও অভিজ্ঞতা আছে? সভ্যতার এই কলঙ্কস্থলগুলি সম্বন্ধে আমি নিজে অনেক কিছু জানি। অভাবে, অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় লোকে কি করে অসুন্দর, পঙ্গু হয়ে ওঠে, এগুলিকে তার উচ্চাঙ্গের ল্যাবরেটরি বলতে পারি। কিছুকাল এখানে চোখ মেলে কাটিয়ে আসলে এতে আর একটুও সন্দেহ থাকে না যে, অর্থই প্রধানত আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রাতা। প্রাচুর্য্যে আমরা কালচার্ড হই, আমাদের ঘুমন্ত ক্ষমতাগুলি বিকশিত হয়, আমরা সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠি। আর অভাবগ্রস্ত মানুষ ঠিক উল্টো ধাপে নিচ থেকে আরও নিচে নেমে গিয়ে মনুষ্যত্বের চরম প্রতিবাদ হয়ে ওঠে।...বস্তিবাসীদের উন্নয়নের আমরা যে পরিকল্পনা করেছি, তার প্রয়োগ করতে গিয়েই এসব তোমরা হাতেনাতে দেখতে পাবে। কিছুই উন্নতি করতে পারবে না। দুটো ড্রেন পরিষ্কার করে নরকের কতটা উন্নতি করা যায়? এর জন্য চাই নতুন সমাজ-সংস্থা, আমূল পরিবর্ত্তন...'

কথাটা যে কত বড় সত্য, তপনের চেয়ে কেউ তা বেশি জানে না। এ কথা সে বহুবার চিন্তা করিয়াছে। একটা অভাবনীয় সৌভাগ্যজনক আকস্মিকতায় সে যদি প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয় না পাইত, তবে তার কি হইত? ভালো ছাত্র হইতে পারিত কি? ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পাইত কি? ইস্কুলে তো সে কাঁচা ছাত্র ছিল। এমন সংস্কৃতিবানদের সংসর্গে আসিতে পারিত? মনের কি এতখানি প্রসার

হইত? এমন মার্জ্জিতভাবে কথা বলিতে পারিত কি? কোনও উচ্চ আদর্শ কি তার মধ্যে গড়িয়া উঠিতে পারিত?

এতদিনে হয়তো সে কোনও কারখানার মিস্ত্রী হইত। বস্তির ঘরে নোংরা লোকদের সঙ্গে থাকিত। নোংরাভাবে জীবন যাপন করিত। নোংরা আনন্দে উপার্জ্জনের অধিকাংশ ব্যয় করিত। পশুর মতো বাঁচিয়া থাকিত মাত্র।

যতই এ কথা ভাবে, তপন শিহরিয়া উঠে। আকস্মিক সৌভাগ্যেই সকলে সৌভাগ্যশালী হয়, সম্পদশালী হয়। ধনীর ঘরে জন্মিয়া ধনীর পুত্র ধনী হয়। তপনের সৌভাগ্যও তার চেয়ে কোনও গহিত আকস্মিকতা নয়। কিন্তু যাহাদের এমন বরাত নয়? সুযোগ পাইলে ইহারাও কি সুযোগ্য হইয়া উঠিতে পারিত না? সবাই না পারুক, অধিকাংশই পারিত। ইহাদের জন্য কি কিছু করা যায় না? সমাজের কি এ সম্বন্ধে সজাগ হইয়া ওঠা উচিত নয়?

'কাকীমা, আমরা আজকে সিনেমায় যাব।'

চায়ের পর রাণীদেবী মাত্র ড্রইং-রুমে ফিরিয়া আসিয়া উমার লেসের ব্লাউজটা ধরিয়াছেন, এমন সময় অতি কাছ হইতে উপরোক্ত অভিলাষ শ্রবণ করিয়া চমকাইয়া চাহিলেন। ইতিমধ্যে নীলা চুপিচুপি কখন কৌচের পেছনে আসিয়া হাজির হইয়াছে। তাহার তিন হাত পিছনে এবং যথাসাধ্য আড়ালে মায়ের রায় শুনিবার জন্য উমা উদ্বিগ্নভাবে দণ্ডায়মান।

'দুজনে বুঝি এতক্ষণ পরামর্শ করে' তাই ঠিক করা হলো?' রাণী প্রশ্রয়ের কণ্ঠে কহিলেন। 'কি ছবি দেখবি শুনি?'

নীলা কহিল।

'কার সঙ্গে যাবি? আমি যেতে পারব না, মা। আমার ঢের কাজ আছে। তপনকে বল গিয়ে, সে যদি রাজি হয়।'

এইবার উমা কাছে আগাইয়া আসিল। নীলার দরবার মোটামুটি মঞ্জুর হইয়াছে, এখন খুঁটিনাটিতে না আটকায়!

'তা হলেই যাওয়া হয়েচে।' উমা কহিল। 'দাদার তো আজকাল এক কাজ, বই পড়া, আর মিটিং করা! সিনেমার কথা হলেই নাক উল্টে বলে, ছেলে-ভুলানো ছড়া! রাবিশ্!'

'রাবিশ্, বেশ।' নীলা কহিল। 'তবু যেতে হবে। আমাদের কাছে তো আর রাবিশ্ নয়। কেবল নিজের মর্জি মতো চলা চলবে না। চল তো, দেখি কেমন না যায়...'

'বল তো গিয়ে, মা।' রাণী সস্নেহে কহিলেন। 'কেবল পড়বে, আর গম্ভীর হয়ে থাকবে। এ বয়সে ছেলেরা কত হেসে খেলে বেড়ায়...'

নীলা আত্মবিশ্বাস সহকারে এবং উমা সন্দেহশীলভাবে উপরতলায় তপনের ঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

রাণীদেবী আবার সেলাই উঠাইয়া লইলেন। সত্যই ইদানীং বড়ো বেশি গম্ভীর হইয়া উঠিতেছে ছেলেটা। কিছুদিন আগেও বেশ আমুদে ছিল। সঙ্কোচ-ভাবটা দূর হইয়া যাইবার পর তপন যেমন চটপটে হইয়া ওঠে, তেমনি পরিহাসপ্রিয় হয়। য়ুনিভার্সিটিতে যোগ দিবার পরও সে রীতিমতো উচ্ছল ছিল। গত কয়মাস হইতে ভারি যেন চিন্তাশীল এবং গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। বেশি পড়াশুনা করার জন্যই এমন হইয়া উঠিয়াছে! আর একটু হাসি-গল্প করিলে রাণীদেবী যেন স্বস্তি বোধ করিতেন। এ ভাবটা কেমন যেন অস্বাভাবিক।

'শুনচেন?'

এবার তপনের চমকাইয়া ওঠার পালা। সে বইয়ের পাতা হইতে চোখ উঠাইয়া একেবারে কাছেই সহাস্যমুখ নীলাকে আবিষ্কার করিল।

'কি খবর, তুমি কখন এলে?'

'চায়ের আগেই। ঘরে বসে চা খেলে কি সব খবর জানা যায়।' নীলা কহিল। 'দেখুন একটা ফরমাস আছে, আগেই পারব না বলতে পারবেন না।...এগিয়ে আয় না, উমা?...'

উমা আত্মপ্রকাশ করিল।

'দুজনেরই সাজ-সজ্জা প্রস্তুত?' তপন কহিল 'মতলব ভালো নয়।...'

'ভালোই তো নয়।' নীলা কহিল। 'ওসব চালাকি চলবে না। আমাদের সিনেমায় নিয়ে যেতে হবে। ছেলে-ভুলানো রাবিশই আমরা পছন্দ করি।'

শেষের লাইনটি তপনের যুক্তি-খণ্ডনে পূর্ব্ব-প্রস্তুতি।

'আমরা সবাই করি।' তপন সহাস্যে কহিল। 'কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের পরিষদের জরুরি মিটিং!...'

'বাঃ রে, কালই তো মিটিং ছিল!' এইবার উমাই প্রতিবাদ করিল। 'কলেজ থেকে দুঘণ্টা দেরি করে ফিরলে না? আবার আজ?...'

'একদিন ভাত খাই বলে আর একদিন খেতে হবে না বুঝি, ভগিনী উমা?'

'ও, ভাত খাওয়ার মতো এত ইম্‌পর্টেণ্ট কাজ!' নীলা কৃত্রিম সম্ভ্রমের সঙ্গে মন্তব্য করিল।

'মতো নয়।' তপন সহাস্যেই কহিল। 'ভাত খাওয়ানোরই কাজ!'

'কাদের?' নীলা সবিস্ময়ে কহিল।

'অনেকদের। অযুত অসংখ্য লোকদের।' তপন এবার গম্ভীর ভাবে কহিল।

'সবার ভাবনা ভাবতে গিয়ে,' নীলা সাভিমানে কহিল, 'আমাদের কথা আপনার আর আজকাল মনেই থাকে না। বেশ, আমরাও দেখে নেব...'

'মনে থাকে না আবার।' তপন সকৌতুকমুখে কহিল। 'আসচে হপ্তায় মঙ্গলবার তোমার জন্মদিন, তা পর্য্যন্ত মনে করে রেখেচি। মস্ত পার্টি দিচ্ছ, শুনচি। অথচ কি খাওয়া হবে, একবার আমাকে জিজ্ঞেসও করোনি। এটা মোটেই মনে থাকার লক্ষণ নয়। দাঁড়াও, কালকে আমরা ভাইয়ে বোনে তোমার ওখানে যাচ্ছি। উৎসবের প্রোগ্রাম আমরা মঞ্জুর করলে তবেই তা গৃহীত হবে...'

'ঈস্!' নীলা সপ্রতিবাদে কহিল, 'আমার যা ইচ্ছে, তাই হবে।'

'মোটেই তা হবে না', তপন চটাইবার চেষ্টায় কহিল। 'কাল চারটের সময় আমরা যাবই, কি বলিস, উমা?...'

'যেন আমি যেতে মানা করচি। চলে আয়রে, উমা।' বলিয়া সখীকে আকর্ষণ করিয়া রীতিমতো রাগান্বিত ভঙ্গিতে নীলা তপনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

দশ

কলেজ হইতে সরাসরি তপন আসিয়াছে। কথা ছিল, উমা বাড়ি হইতে একই সময় এখানে হাজির হইবে। পৌঁছিতে তপনের আধ ঘণ্টা দেরি হইয়াছিল, কিন্তু আসিয়া দেখিল, উমা তখন পর্য্যন্ত আসে নাই। ইহার সামান্ত পরে প্রতাপ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং আসিলেন। উমার কাছে লোকজন আসিয়া পড়ায় সে আসিতে পারিল না, এই খবর দিয়া নীলাকে হতাশ্বাস করিয়া তিনি উপরতলায় ব্যানার্জ্জি-সাহেবের কাছে কাজের প্রয়োজনে প্রস্থান করিলেন।

সেই হইতে তপন একক নীলাকে রাগাইয়া একশেষ করিতেছে।

সম্প্রতি চা-পানের পর দোতলার ড্রইং-রুমে পিয়ানোর এক পাশে চেয়ার টানিয়া পিয়ানোকে টেবিল হিসাবেই তপন ব্যবহার করিতেছে। হাতে ফাউণ্টেন-পেন খোলা, সমুখে কাগজের ফর্দ মেলা, স্বরলিপি পুস্তক ঠেলিয়া দূরে সরানো হইয়াছে। ফর্দ্দের আরও দু'জায়গায় কলম চালাইয়া সে পিয়ানোর টুলে উপবিষ্ট নীলার দিকে চাহিল। বেচারির মুখে কেমন একটা বকা-খেতে-ভীত কিন্তু আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর ভাব। তপনের প্রায় হাসি পাইল, কিন্তু গাম্ভীর্য্য যে কণামাত্রও ক্ষুণ্ণ করিল না।

সামনের ফর্দ্দ চোখের কাছে তুলিয়া পিয়ানোর গায়ে পা দিয়া সে পড়িল: 'তৃতীয়, রুবির সাগর-নৃত্য। সাংঘাতিক ব্যাপার, জাহাজ-ডুবি না হয়! তা যেন হোল, কিন্তু কই, হোস্টেস্, নীলা দেবীর নৃত্যটি কোথায়? সাগর-জলে ডুবে গেল নাকি?...'

'নীলা দেবী কোনই নাচ দেখাচ্ছেন না,' নীলা কহিল। 'তিনি বুড়ি হয়ে গেছেন।'

'ও, সেটা আমি লক্ষ্য করিনি,' ফর্দে চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া তপন কহিল। ...চতুর্থ, গান—নীলা। "সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে।" না, এটি চলবে না।' চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাগজটি পিয়ানোর উপর রাখিয়া তপন এই গানটি কলমের এক আঁচড়ে বাতিল করিয়া দিল। 'এইখানে এই গানটা।' বলিয়া হাতের নাগালে পাওয়া গানের বইটি কাছে টানিয়া পাতা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া উচ্চারণ করিল: 'আমার একটি কথা, বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে...'

'না, কিছুতেই না। ও গান কিছুতেই আমি গাইব না।' নীলাও এবার সপ্রতিবাদে উঠিয়া দাঁড়াইল। 'দিয়ে দিন, আমার লিস্ট...'

তপন ফর্দ্দ প্রত্যর্পণের কোনও চেষ্টাই করিল না। ইহার উপর এক দফা কলম চালাইয়া সে পুনর্ব্বার সংশোধনে উদ্যত হইল। কহিল, 'আর এইখেনে নীলা দেবী নৃত্য: আগুন নিয়ে খেলা...'

নীলা আর বাচনিক প্রতিবাদ করিল না, এক টানে ফর্দ ছিনাইয়া নিল। কহিল, 'কিছু সাহায্য করবেন না, মিছিমিছি গণ্ডগোল বাধাতে এসেচেন। উমা এলে আমার ঢের বেশি কাজ হতো...'

'অসম্ভব।' তপন কহিল। 'সে কখনই এতটা কাটাকাটি করতে সাহস পেত না। কতটা উপকার করে গেলাম ক্রমে ক্রমে তা টের পাবে। ওস্তাদেরা এই করে। নিজ হাতে কোন কাজই করে না, শুধু অন্যের কাজের ত্রুটি ধরে বেড়ায়। এতেই তাদের যত মান!... কিন্তু কই, খাওয়ার লিস্ট কই? বেমালুম চাপা দিয়ে রাখা হয়েচে!...'

'হ্যাঁ, চাপা দিয়ে রাখা হয়েচে, আপনাকে বলেচে!' নীলা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে সপ্রতিবাদে কহিল। 'সরকার-মহাশয়কে খাওয়ার লিস্ট

পাঠাতে বলে এলাম না।…বাবা, বাবা! আমি আর পারি না।…প্যাঁচাবাবু, ও প্যাঁচাবাবু…’

সহসা তপনের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া নীলা থামিয়া গেল। দেখা গেল, পিয়ানোর অপর দিকে বিবিধ ফর্দ্দ হাতে প্যাঁচাবাবু নীরবে দণ্ডায়মান আছেন। চোখ মেঝেতে নিবদ্ধ।

‘আপনি মানুষকে পাগল করে দিতে পারেন!’ নীলা হতাশার কণ্ঠে কহিল। ‘কাছটিতে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ একটুও সাড়া দেবেন না।…কই, খাওয়ার লিস্ট্ কই? দেখুন না, ইনি কি বলছেন…’

প্যাঁচাবাবুর হাতে ঠিক ফর্দ্দটি ধরাই ছিল, তিনি নীরবে সেটা আগাইয়া দিলেন।

নীলা সেটি গ্রহণ করিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছিল, কিন্তু তপন আগেই ছোঁ মারিয়া সেটা সংগ্রহ করিল। দ্রুত ফর্দ্দের উপর চোখ বুলাইয়া সে উপরওয়ালার ভঙ্গিতে কহিল, ‘উহুঁ, এতে চলবে না, মোটেই চলবে না। যে গার্ডেন পার্টিতে রসগোল্লা দেওয়া হয় না, সেটা পার্টিই নয়! এ খাওয়া খাওয়াও গিয়ে তোমার মিসেস্ পার্কিংটনকে—আমাদের রসগোল্লা চাই। রসগোল্লা চাই!’ বলিয়া সে প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল।

নীলা প্যাঁচাবাবুর দিকে চাহিয়া অসহায় ভাবে কহিল, ‘ও প্যাঁচাবাবু!’ ভাবখানা এই, পরাজয়ের হাত হইতে এবার আমাকে বাঁচান।

প্যাঁচাবাবু কিছুই বলিলেন না, কোটের ডান পকেট হইতে আর একটি ফর্দ্দ বাহির করিয়া তাহার একটি সংখ্যার উপর পেন্সিল দিয়া ঢেঁড়া কাটিয়া তাহা তপনের পিয়ানোর উপর মেলিয়া দিলেন।

উহার উপর একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া নীলা সগর্ব্বে তপনের দিকে চাহিল। তাহার দুই চোখ ঠেস্ দিয়া কহিল, ‘কেমন জব্দ!’

'আর স্ট্র ? স্ট্র-র কথা লেখা হয়েচে ?' তপন প্রশ্ন করিল।

প্যাঁচাবাবু এইবারও কথা কহিলেন না। পিয়ানোর উপর হইতে পূর্ব্বোক্ত ফর্দ্দটি সংগ্রহ করিয়া তিনি আর একটি সংখ্যার উপর ঢেঁড়া কাটিয়া দিলেন।

'গুড্, গুড্!' নীলা খুশি হইয়া কহিল। 'প্যাঁচাবাবু থাকতে কিছুটি বাদ পড়বার উপায় নেই…'

'উপায় নেই ?' তপন রগড় অব্যাহত রাখিয়া কহিল। 'দাও, লিস্টটা দাও, এক্ষুণি বের করে দিচ্ছি। দিন তো, প্যাঁচাবাবু, আপনার হাতের লিস্ট্ দুটো…'

প্যাঁচাবাবু নিঃশব্দে, কিন্তু সসম্ভ্রমে, দুটো ফর্দ্দই আগাইয়া দিলেন।

তপন উভয় ফর্দ্দের প্রত্যেকটি সংখ্যার উপর হাত বুলাইয়া ত্রুটি অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল। নীলা উদ্বেগে সারা হইল। কোন্ অপ্রত্যাশিত দিক হইতে যে আক্রমণ আসিবে ভাবিয়া পাইল না।

অবশেষে দুটো ফর্দ্দই তাচ্ছিল্যভরে পিয়ানোর উপরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তপন কহিল, 'দূর, এ আবার লিস্ট! পানের কথাই লেখা হয়নি। ছাখো পড়ে।…ধ্যেৎ, ধ্যেৎ!…'

'ও প্যাঁচাবাবু!' নীলা কাতর কণ্ঠে ডাকিল।

প্যাঁচাবাবু কোনও জবাব দিলেন না। নীরবে বাঁ পকেট হইতে তৃতীয় ফর্দ্দ বাহির করিয়া আনিলেন। ইহার একটি সংখ্যায় ঢেঁড়া কাটিয়া তিনি ইহা যথাস্থানে পেশ করিলেন।

নীলা উল্লাসে প্রায় লাফাইয়া উঠিল। ছুটিয়া গিয়া প্যাঁচাবাবুর কাঁধে সে অজস্র ঝাঁকুনির পুরস্কার বর্ষণ করিতে লাগিল। রীতিমতো বিজয়িনীর ভাব। তপনের দিকে কৃপাদৃষ্টি হানিতে আর কোনই অসুবিধা নাই। পিয়ানোর টুলে সে নিজেকে সজোরেই নিক্ষিপ্ত করিল।

আড়চোখে পরাজিতের দিকে একবার চাহিয়া সে আক্রমণাত্মক কণ্ঠে গান শুরু করিল : 'ও সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে···'

অবিলম্বে তপনের দুই হাতের দুই আঙুল নিজের উভয় কানের গর্ত দুটির দিকে ধাবিত হইল। মুখ বিপরীত দিকে ঘুরিয়া গেল। কান চাপিয়া দৃষ্টি অপর দিকে ন্যস্ত করিয়া সে অমনোনীত গান না শুনিবার চেষ্টার ত্রুটি করিল না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ব্যানার্জি-সাহেবের লাইব্রেরিতে ব্যবসা সংক্রান্ত আলোচনা চলিয়াছে। ব্যানার্জি-সাহেব তার আরাম-চেয়ারেই বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখোমুখি বসিয়া, একটা দলিলপত্র-আকীর্ণ টিপয়ের ব্যবধানে প্রতাপবাবু কিছু কাগজপত্র গুটাইয়া ফেলিতেছেন। প্রতাপ মুখুজ্জে এখন আর রায়বাহাদুর নন। ইংরেজ-বিদায়ের পর তিনি ইংরেজদত্ত খেতাবটিও গুদামজাত করিয়াছেন।

'এবার এসব থাক', ব্যানার্জি-সাহেব আড়মোড়া ভাঙিয়া কহিলেন। 'বিষয় থাকলে ঝামেলা থাকবেই। মন খুলে একটু গল্প করা যাক, এসো। অনেকদিন তোমার দেখা নেই।···এসব চলবে ?'

বাঁ পাশে নিচু পেগ্-টেবিলের উপর একটা হুইস্কির বোতল, সোডার টাম্‌লার ও কতকগুলি গেলাস ছিল, ব্যানার্জি-সাহেব সে দিকে হাত বাড়াইলেন।

'না, ভাই, ও আর চলবে না', প্রতাপ মুখুজ্জে কহিলেন। 'বহুদিন ওসব ছেড়ে দিয়েচি···'

ব্যানার্জি-সাহেব গ্লাসে সামান্য মদ্য ঢালিয়া তার সঙ্গে সোডা মিশাইলেন। কহিলেন, 'তুমি সুখী লোক, প্রতাপ। স্ত্রী, কন্যা, এবং— এবং ছেলে নিয়ে আনন্দে আছ। আমি কি নিয়ে থাকি বলো ? কিছু

নিয়ে তো থাকতে হবে। নির্জ্জনতার সঙ্গী হিসেবে এই তো একমাত্র অবলম্বন!···ভাবচি, নীলু-মা যখন স্বামীর ঘরে চলে যাবে, তখন এই শূন্য বাড়িটায় একলা আমি থাকব কি করে···'

প্রতাপবাবু একবার করুণ দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিলেন। নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র এই মেধাবী ব্যবহারজীবী তাঁহার আশৈশব বন্ধু। মাত্র পয়তাল্লিশ বছরে স্ত্রী-বিয়োগের পর মনে হইয়াছিল আর তিনি দাঁড়াইতে পারিবেন না। কিন্তু আশ্চর্য্য শক্তিতে তিনি অত্যল্পকালের মধ্যে খাড়া হইয়া উঠিলেন। কাজের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পূর্ব্বেই তিনি খ্যাতিমান ব্যারিস্টার ছিলেন। এখন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছেন। রাজনৈতিক মোকদ্দমা বিনা পয়সায় করিয়া দেওয়ায় এই প্রসিদ্ধি আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে! ব্যারিস্টার মহিম ব্যানার্জ্জি সর্ব্বজনপরিচিত।

মা-হারা মেয়ে নীলাকে তিনি বন্ধু প্রতাপ মুখুজ্জের বাড়িতে সঙ্গ এবং মাতৃস্নেহ লাভের জন্য পাঠাইতেন। এই সম্পর্কেই দুই পরিবারের আত্মীয়তা এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

'একটা কথা মনে করিয়ে দিলে, মহিম।' প্রতাপবাবু একটু ভাবিয়া কহিলেন। 'হ্যাঁ, দেখো, অনেকদিন ধরেই তোমাকে কথাটা বলব ভাবচি!···নীলু-মা যেমন তোমার মেয়ে, তেমনি আমারও ঘরের মেয়ের মতো। একে দূরে পাঠিয়ে তুমি কি থাকতে পারবে? তার চেয়ে আমাকেই ওকে দিয়ে দাও না কেন। তবে তোমারও সে থাকবে।···তপনকেও তো তুমি পছন্দ করো। লেখা-পড়ায় যেমন ভালো হয়ে উঠেচে, তেমনি সৎ হয়েচে। এ রকম ছেলে নিয়ে যে কেউ গর্ব্ব বোধ করতে পারে···'

'নিশ্চয়ই পারে!' ব্যানার্জ্জি-সাহেব একবার চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

যেন নিজের মনে ভাবিতে লাগিলেন। কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন।

'হ্যাঁ, দেখ!' সহসা তিনি যেন চিন্তার মধ্য হইতে জাগ্রত হইয়া কহিলেন, 'কথাটা আমি একেবারে ভেবে দেখিনি তা নয়। কিন্তু কি জানো...কি রকম ভাবে কথাটা তোমাকে বলব ঠিক বুঝতে পারছি নে মানে, ওর কোনও বংশ-পরিচয় জন্ম-পরিচয় না থাকায় আমার মনে কেমন একটা খুঁৎখুঁতে ভাব আছে, যাকে কিছুতেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না...'

'তোমারও!' প্রতাপবাবু প্রায় আহত কণ্ঠে কহিলেন।

'আশ্চর্য্য বলতে হবে, তাই না?' মহিম ব্যানার্জ্জি হাসিবার ক্ষীণ চেষ্টা করিলেন। 'কোনও সংস্কারেই কখনও বিশ্বেস করিনি। কিন্তু মেয়ের বিয়ের সম্পর্কেই কোথা থেকে হুফ্ করে' সংস্কারটা ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। সোশ্যাল্ ডিপজিট্ মনের কোন্ স্তরে চুপ করে ঘাঁটি আগলে বসে ছিল, কে বলতে পারে। যুক্তি দিয়ে একে ঝেঁটিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি, পারিনি।...এ যদি হতে পারত, তবে এর চেয়ে কাম্য আর কিছু ছিল না। কিন্তু কোথায় যেন আপত্তি টের পাচ্ছি। হয়তো একেও একদিন দূর করতে পারব, কিন্তু আজ কিছুতেই পারছি নে... আর একটু চা খাও, প্রতাপ।...নীলা যে আমার সব...তার সুখে যেন একটুও খুঁত না থাকে, এই হলো আমার একমাত্র ভাবনা...আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা...প্রশ্নটা খোলাই থাক না, প্রতাপ। কোনও তাড়াতাড়ি তো নেই...'

প্রতাপবাবু সংক্ষেপে কহিলেন, 'ঠিক আছে।'

প্রতাপ মুখুজ্জে প্রধানতঃ ব্যবসায়িক পরামর্শের জন্য গেলেও তাহার অন্য প্রস্তাবটি একেবারে আকস্মিক ছিল না। রাণীদেবী বহুদিন ধরিয়াই মহিম ব্যানার্জ্জির কাছে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য স্বামীকে তাগাদা দিয়া আসিতেছিলেন। নীলা তাহাদের বাড়ির মেয়ের মতো। একে যদি বউ করিয়া ঘরে আনা যায়, তবে এর চেয়ে আনন্দ আর কি হইতে পারে। এক্ষুণি বিয়ে হইবে, এমন কথা নয়। কিন্তু কথাটা পাকা হইয়া থাকিলে সব দিক হইতেই তাহা অভিপ্রেত। তপন দেখিতে যেমন সুদর্শন ও স্বাস্থ্যবান হইয়াছে, ভালো ছাত্র হিসাবে তেমনি নাম করিয়াছে। সে যে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ছেলে নয়, তাহা মুখুজ্জে-দম্পতী প্রায় ভুলিবার উপক্রম করিয়াছেন। সহসা আজ অপ্রিয় ইতিহাস স্মরণ করাইয়া দিলেন মহিম ব্যানার্জ্জি।

প্রতাপবাবু গম্ভীরমুখেই বাড়ি ফিরিলেন। এখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা। হাত পা ধুইয়া বস্ত্র-পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতাপবাবু দোতলার শয়নঘরের সামনে দক্ষিণের চওড়া বারান্দায় তাহার নিজস্ব ইজিচেয়ার-টায় আসিয়া শুইয়াছেন। উঁচু আলোর স্তম্ভ হইতে বিদ্যুৎ-আলো তার চারপাশে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এই আলোর বৃত্তের মধ্যেই রেলিংএর দিকে পিঠ দিয়া চামড়ার গদি-আঁটা মোড়ায় বসিয়া রাণীদেবী উল বুনিতেছেন। কিন্তু আঙুল চলিতেছে না, যেন জবাবের অপেক্ষা করিতেছেন।

মুখুজ্জে-মশায়ের চোখের সামনে সকাল বেলার খবরের কাগজ মেলা।

গড়গড়ার নল সর্পিল ভঙ্গিতে উঠিয়া আসিয়া মুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি অলসভাবে গড়গড়া টানিতেছেন।

'কেবল গড়গড়ায় ফর্‌ফর্‌ করে' টানচ, কথার জবাব দিচ্ছ না।' রাণীদেবী অধৈর্য্য হইয়া কহিলেন, 'আর কি বল্লেন, তাই বলো না?'

'ঐ তো বল্লে,' প্রতাপবাবু গড়গড়ার শব্দ থামাইয়া কহিলেন। 'তপন খুবই ভাল ছেলে সন্দেহ নাই, কিন্তু ওর বংশ-পরিচয় জন্ম-পরিচয় না থাকায় খুঁৎখুঁৎ করচে। যতই সাহেব হই না কেন, মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় অনেক পুরুষের প্রাচীন সংস্কার কোথা থেকে দেখা দেয়। আমাকে একটু ভাবতে দাও ইত্যাদি। তবেই অবস্থাটা বুঝতে পারচ...'

'তুমি বললে না কেন, উমার সঙ্গে তপনের আমরা কোন তফাৎ করিনে।' রাণী উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিলেন। 'সে আমাদেরই ছেলে, এই তার বংশ-পরিচয়। আমাদের যা কিছু আছে, উমার সঙ্গে সেও তার সমান অংশ পাবে, আমরা কোনই তফাৎ...'

প্রতাপবাবু এবার গড়গড়ার নল মুখ হইতে আরও দূরে সরাইলেন। গম্ভীর গলায় কহিলেন, 'টাকার লোভ মহিমকে দেখিয়ে কিছু লাভ আছে কি? টাকা তারও কিছু কম নেই। তার এই আপত্তি তার মনের আপত্তি। নইলে কখনও সে একথা আমাকে বলত না। তার মতো ভদ্রলোক ক'জন আছে?...'

বাবা ও মায়ের এই কথাবার্ত্তা একজন আড়ি পাতিয়া শুনিতেছিল। সে উমা। বিষয়টি সম্বন্ধে তাহার আগ্রহ অন্যান্যদের চেয়ে কম তো নয়ই, হয়তো একটু বেশিই।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া সিঁড়ির মুখ হইতেই এই আলোচনা

সে শুনিতে পায়। শুনিতে পাইয়া এক মুহূর্তে সে ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। আরও স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্য সে চুপে চুপে পাশের ঘরটিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং বারান্দার দিকের অন্যতম দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া পর্দার আড়ালের স্ট্র্যাটাজিক জায়গাটি দখল করিয়াছে।

অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞানলাভ করিবার পর সে একেবারে মুষ্‌ড়াইয়া পড়িল। এ কি রকম অন্যায় আচরণ? আভাসে ইঙ্গিতে নীলার মনোভাব সে যতটা আঁচ করিয়াছে, তা মোটেই কাকাবাবুর এই মতের সঙ্গে মেলে না। এ কি রকম বিচার! গরিবের বাড়ি হইতে দাদাকে আনা হইয়াছে বলিয়া সে বুঝি ফেলনা? তার মা তার ছেলেবেলায় মারা গিয়াছে, এ বুঝি তার নিজের দোষ? যেটা তার নিজের দোষ নয়, সে জন্য তাকে দায়ি করা হইবে কেন? নিজের ক্ষমতায় দাদা কত বড় নামকরা ছাত্র হইয়াছে। এমন ভালো ছেলে ক'টা পাওয়া যায়!

উমার দারুণ রাগ হইল। অনুপস্থিত ব্যানার্জ্জি-সাহেবের যুক্তিজাল ছিন্নভিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বিপক্ষদলের কৌঁসলীর মতোই সে বাবা ও মার সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হইল না। সিঁড়ির দিক হইতে জুতা ও রেলিংয়ের একটা সংঘাতের শব্দে সে চমকিয়া চাহিল। দেখিল, সিঁড়ির মুখে তপন চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়াইয়া আছে। যেন মার খাইয়াছে। সে মূর্ত্তি দেখিয়া উমার আর সন্দেহ রহিল না, খবরটা জানিতে তপনের বাকি নাই। উমা শিহরিয়া উঠিল। তপন যে কতখানি অভিমানী তা সে জানে।

'দাদা!' সে ভীতভাবে ডাকিল।

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না। এই ডাক তপন শুনিতে পাইল কি পাইল না, সেই জানে। শুধু বিকল ইঞ্জিন সহসা প্রাণলাভ করিলে

যেমন একটা অস্বাভাবিক ঝাঁকুনি দিয়া চলিতে শুরু করে, তপনও তেমনি টলিতে টলিতে নিজের কামরার দিকে আগাইয়া গেল।

ইহার পর একটা সম্পূর্ণ দিন কাটিয়াছে। তপনের ব্যবহারে কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না করিয়া উমা যেন অনেকটা আশ্বস্ত হইয়াছে। হয়তো তার আশঙ্কা অমূলক। তপন কিছুই জানেনা, সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়াও কিছু শুনিতে পায় নাই। যদি তা হয়, তবে কাকাবাবুকে বুঝাইবার সময় ও সুযোগ পাওয়া যাইবে। নীলাকে ভালো করিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইবে। ব্যাপারটার কাম্য-পরিসমাপ্তি হইবে।

সন্ধ্যার পর রাণী দেবী একা ড্রইং-রুমে বসিয়াছিলেন। প্রতাপবাবু বাইরে নিমন্ত্রণে গেছেন। উমা পড়িতেছে। তপনও নিজের কাজে ব্যস্ত। এই ফাঁকা সময়টা রাণী একা বসিয়া বুনিয়া কাটান। স্বামীর জন্য এবং তপনের জন্য সুয়েটার-মাফ্‌লার, উমা ও নীলার জন্য ব্লাউজ ও জাম্পার কত যে তিনি বুনিয়াছেন, তার ঠিক নাই।

'মা'।

রাণী দেবী চমকাইয়া শেলাই হইতে চোখ উঠাইলেন। কহিলেন, 'কি রে, তপন। আয়, বস...'

'আমি দিন পনেরো বাইরে থাকব, মা।'

'বাইরে থাকবি!' রাণী সবিস্ময়ে কহিলেন। 'কোথায়?'

'আমাদের সমিতি থেকে ঠিক হয়েচে', তপন মায়ের চোখে চোখে না চাহিয়া কহিল, 'বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে' দুঃখী লোকদের সত্যিকার অভিযোগগুলি জেনে নিতে হবে। প্রতিবাদ জানাবার, অভিযোগ জানাবার এদের ভাষা নেই। সেই ভাষা আমাদেরই জোগান দিতে হবে। এদের অভিযোগ সাধারণের কাছে, গভর্ণমেণ্টের কাছে উপস্থিত

করতে হবে। কিন্তু তার জন্য চাই ব্যক্তিগত জ্ঞান। স্থির হয়েচে, কিছু দিন বস্তিতে বস্তির লোকেদের সঙ্গে বাস করে এই জ্ঞান আহরণ করতে হবে।...'

'সে কি রে!' রাণী সভয়ে কহিলেন। 'ঐসব নোংরা জায়গায় ঘুরলে অসুখ-বিসুখ করবে যে! না না, আর যা ইচ্ছে করো, সেটি করো না...'

তপনকে যে বস্তি হইতেই সংগ্রহ করা হইয়াছিল, এই রূঢ় অথচ বেদনাদায়ক স্মৃতি রাণী প্রাণপণে দূরে রাখিতে চান। বস্তির কথায় তার অবচেতন মনের কোথায় যেন একটা আশঙ্কা লুকায়িত আছে। ইহার কাছ হইতে যেন তপনকে বিশেষ সাবধানতা সহকারে দূরে রাখা দরকার।

'সমিতিতে এই প্রস্তাব আমিই উঠিয়েছিলাম, মা,' তপন কহিল। 'এখন আমার পিছিয়ে যাওয়া চলে না। কিন্তু এতে ভয় কি। দিনের পর দিন লক্ষ লক্ষ লোক যদি এই নোংরা আবহাওয়ায় বাস করতে পারে, আমরা কি দু' হপ্তাও পারব না।...তুমি দুঃখ পেয়োনা, মা; এই বস্তির আবহাওয়ায়ই আমার শৈশব কেটেছে। সেই শ্বাস-বন্ধ-করা আবেষ্টন থেকে তুমি অসীম করুণায় আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেচ। যে সুযোগ আমি জীবনে কল্পনা করতে পারতাম না, তোমার স্নেহের দয়ায় সেই সুযোগ আমি পেয়েচি। কিন্তু সুযোগ যারা জীবনে পায় না, তাদের কি উপায়? তাদের দুর্দ্দশা কি আমরা ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিয়ে একেবারে উদাসীন থাকব? এদের উদ্ধারের জন্য কোনও চেষ্টাই করা হবে না? ..'

রাণীদেবী উদ্বিগ্ন হইলেন। ছেলেটা এই রকম ভাবে যখন কথা বলে, তখন তিনি ভয় পাইয়া যান। এ আর পরিহাস-তরল তপন নয়, এ স্থির-প্রতিজ্ঞ পুরুষ। তাহার সিদ্ধান্ত হইতে তাহাকে টলানো অসম্ভব।

'তুই আমার কাছ থেকে টাকা নে, তপন,' রাণী শঙ্কিতকণ্ঠে কহিলেন। 'দুঃখী অভাগাদের মধ্যে বিলিয়ে দে। তাদের উপকার হবে। কিন্তু তুই নিজে আর ওদের মধ্যে গিয়ে থাকিস নে। তাতে কার আর কি লাভ হবে বল, উল্টে তোরই...'

তপন চোখ তুলিয়া কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে এই স্নেহময়ী জননীর দিকে চাহিল। ইহাকে আঘাত করিতে কষ্ট হয়। কিন্তু যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া সে বিশ্বাস করে, তাহা পালন না করিয়া উপায় কি? নিজেকে সে প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিতে আবিষ্কার করিয়াছে। ধনীর ঘরে লালিত হইলেও সে জনতার একজন। এই নামহীন জনতার পরিচয়ই তাহার পরিচয়। তার বংশ-পরিচয় নাই, জন্ম-পরিচয় নাই। সম্ভ্রান্ত সমাজে এটা তাহার অমার্জ্জনীয় ত্রুটি। নিজেকে জনতার অংশ হিসাবে গণ্য করিলে এই ত্রুটি বিলুপ্ত হইয়া যায়। যাহারা বাঁচিতে চায়, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে চায় উন্নতি, করিতে চায়, তপন সেই বিশেষপরিচয়হীন, অথচ সদাজাগ্রত সদাজীবন্ত, সদাআকাঙ্ক্ষাশীল অনন্যপরিচয় মানুষ-জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

'সৎ কাজে দান করার জন্য তোমার কাছ থেকে অনেক টাকাই নিয়েছি, মা।' তপন অনেকটা হাল্কা গলায় কহিল। 'তোমার সব টাকা ফুরিয়ে যাবে, তবু কিন্তু মানুষের দুঃখ দূর হবে না। এ প্রকাণ্ড দুঃখ দু'দশজনের ব্যক্তিগত সাহায্যে দূর হবার নয়। এর জন্য সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন করা দরকার। ধনী আর দরিদ্রের প্রচণ্ড তফাৎ দূর করা দরকার। নূতন যুগের প্রগতিশীল মানুষ এই দুঃখ দূর করবার নানা উপায় চিন্তা করেচে। তার কোনওটা বা কার্য্যকরী, কোনওটা বা অসম্ভব। আমাদেব দেশে রাশিয়ার বিপ্লবকারী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সম্ভব হোক আর না হোক, ইংলণ্ডের মতো

সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব নয়! ধনীদের বেশি করে ট্যাক্স করে, বড় বড় কল-কারখানা সরকারী সম্পত্তি হিসেবে চালিয়ে তার মোটা মুনাফা থেকে দরিদ্রের জন্য স্থবিধে করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আজ ইংলণ্ডে ছেলেদের স্কুলে পড়তে মাইনে লাগে না, বিনা পয়সায় বই দেওয়া হয়, নিম্নতম মজুরি বেঁধে দেওয়া হয়েছে, ডাক্তারি চিকিৎসা করাতে পয়সা লাগে না। বুড়ো বয়সে সবাই সরকারি পেন্সন পায়। আরও কত রকম স্থবিধে। বলো তো, সে কি দেশ! আমাদের দেশের তুলনায় স্বর্গ। এসব কবে আমাদের দেশে হবে! যদি আমাদের শাসকদের কানে এসব কথা বারবার বেশ জোর গলায় না পৌছে দিই, তবে তারা ক্ষমতার আনন্দে আর আলস্যের আরামে প্রচলিত ব্যবস্থার গায়ে আঁচড়টুকু পর্য্যন্ত দেবেন না। এ জন্যই আমাদের এত চেঁচামেচি করতে হচ্ছে। নইলে...'

'এ নিয়ে আবার কোনও হাঙ্গামা-টাঙ্গামায় পড়বি নে তো?' রাণী উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলেন। 'উনি বলছিলেন, পুলিশ এসব কাজ খুবই সন্দেহের চোখে দেখে, এসব...'

'হ্যা, দেখে।' তপন একটু থামিয়া কহিল। 'অনেক ক্ষেত্রে সন্দেহের কারণ নেই, তাও বলা যায় না। কিন্তু যেটা আমার দেশের পক্ষে, দেশের অযুত লোকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, তার চেষ্টা করতেই হবে—তা পুলিশ সন্দেহ করুক আর নাই করুক।... আচ্ছা, মা একটা কাজ করলে হয় না? আমি কলেজের হস্টেলে গিয়ে থাকি নে কেন...'

'সে কি রে!' রাণী দেবী স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন।

'পুলিশের দৃষ্টি যদি আমার উপর পড়ে, তবে যেন আমার বাড়ির অন্যদের তার ফলভোগী হতে না হয়। এটা আমার একটা উদ্বেগের কারণ হয়েচে।' তপন মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল।

'দূর, পাগ্‌লা ছেলে। পুলিশ আমাদেরও হয়রাণ করবে, এই বুঝি আমরা ভাবচি!' রাণী তিরস্কারের কণ্ঠে কহিলেন। 'আমাদের শুধু একমাত্র ভাবনা, তোর যেন অমঙ্গল না হয়, ক্ষতি না হয়, বড় হবার পথে কোন বাধা না ঘটে...'

'তা আমি খুব জানি, মা।' বলিয়া তপন তাড়াতাড়ি মায়ের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। 'তোমাকে যেন হতাশ না করতে হয়, তোমার দেওয়া সুযোগের যেন সদ্‌ব্যবহার করতে পারি, সারাক্ষণ তো সেই চেষ্টাই করচি...'

বারো

উমার গাড়ি ব্যানার্জ্জি-সাহেবের বাড়ির ফটকের ভিতর ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ির ভিতর হইতে নীলার জন্মদিবসোৎসবের বিরাট আয়োজন চোখে পড়িল। দালানের সামনের বিস্তৃত ও নরম সবুজ কার্পেটের মতো সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন লন্-এ অজস্র টেবিল-চেয়ার সাজান। বিলাতী হোটেলের উর্দ্দিপরা পরিবেশনকারীরা ব্যবস্থা ত্রুটিহীন করিতে ব্যস্ত। প্যাঁচাবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে, কিন্তু নির্ব্বাক মুখে, খুঁৎ ধরিয়া বেড়াইতেছেন।

এ সমস্ত বামে রাখিয়া ফুলের বেড্-এর পাড় বসানো মোটর-ড্রাইভ্ ধরিয়া উমার মোটর-গাড়ি গাড়ি-বারান্দায় আসিয়া থামিল। শিখ দারোয়ান উত্তম সিং তাড়াতাড়ি আসিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দাঁড়াইল। উমা প্রায় অধৈর্য্যভাবে গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল।

নিজের শোবার ঘরে তিন-আয়নার প্রকাণ্ড ড্রেসিং-টেবিলের সামনে চামড়ায় মোড়া টুলে বসিয়া নীলা প্রসাধন করিতেছিল। আয়নায় একবার নিজের সুন্দর মুখটার দিকে চাহিয়া দেখিয়া সে চুলের মধ্যে নির্দ্দয়ভাবে চিরুণী চালাইল। উমাকে তাড়াতাড়ি আসিতে বলিয়াছে; তার আসার আগেই তৈরি হইয়া লওয়া চাই।

তৈরি অনেকটাই হইয়া আসিয়াছে। ড্রেসিং-টেবিলের উপর হইতে এইবার সে মখমলের ছোট বাক্সটা হাতে তুলিয়া লইল। বাবার জন্মদিনের উপহার নীলার পরম গর্ব্বের বস্তু। ডালা খুলিয়া সে প্রজাপতির মতো

সুন্দর নীলা-খচিত এক জোড়া কানবালা খুলিয়া প্রশংসমান দৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিল। একটি কানে পরিতে লাগিল।

ঠিক এমন সময় বাইরে উমার গলার আওয়াজ: 'এখনও সাজচেন, দিদিমণি!' পরমুহূর্ত্তে ঘরের দরজা ঠেলিয়া সে প্রায় হুড়মুড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

'আয়, উমা, আয়,' নীলা সহর্ষে দাঁড়াইয়া উঠিল। 'আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। কে জানত একটা পার্টি দিতে এতটা হাঙ্গামা। আমি একলা কোন্ দিক সামলাই বল?···তোর দাদা এসে কেবল গণ্ডগোল বাঁধাতে পারে, কোনও কাজ করবার বেলায় নেই। এসেচে?···কাকাবাবু কাকীমা এসেচেন?···'

উমা কাছে আসিয়া হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতর হইতে নীরবে একটা কৌটা বাহির করিয়া এবং ইহার ডালা খুলিয়া নীরবেই তাহা ড্রেসিং-টেবিলের উপর স্থাপন করিল। একজোড়া জড়োয়ার বালা চকচক্ করিয়া উঠিল।

'ওঃ, কী চমৎকার!' একবার মাত্র সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নীলা সখীকে জড়াইয়া ধরিল।

উমা এই উচ্ছ্বাসে ভ্রূক্ষেপ করিল না। পূর্ব্বের প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া এতক্ষণ পরে সে গম্ভীরভাবে কহিল, 'না, দাদা আসেনি। আসবে না। মা বাবা পরে আসবেন···'

'আসবে না কেন!' নীলা আশ্লেষ ত্যাগ করিয়া স্তম্ভিতভাবে কহিল। 'দাঁড়াও, আমি টেলিফোনে বলছি। মজাটা দেখাচ্চি···' নীলা প্রস্থানোদ্যত হইল।

'তার আগে কি হয়েচ শুনে নে।' উমা দেওয়ালের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল।

'কি হয়েচে?' এইবার নীলা শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

উমা যাহা জানে বলিল। তপনের আচরণে একবার তাহার মনে হইয়াছিল, ব্যানার্জ্জি-সাহেবের প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে সত্যই সে কিছু শোনে নাই। তারপর ক্রমে তার সন্দেহ রহিল না। বস্তিতে যাইয়া কিছুদিনের জন্য বাস করিবার সংকল্প যখন করিয়াছে, তখন তাকে টলানো অসম্ভব। সে যেমন অভিমানী, তেমনি জেদী। তপন যাওয়ার উদ্যোগে ব্যস্ত ছিল, উমা যাইয়া পীড়াপীড়ি করিয়া কহিল, 'অন্তত আধ ঘণ্টার জন্য চল না। তাতে এমন কি ক্ষতি হবে?' তপন তাহার স্বভাবসুলভ হাল্কা ভাবে জবাব দিল, 'দশ মিনিটের গাফিলতিতে ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজয় হয়েছিল, আধঘণ্টাতে কি না হতে পারে? বংশ-পরিচয়হীন দুর্ভাগাদের একজনও যদি নীলার উৎসব-সভায় হাজির না হয়, তবে কোনই ক্ষতি হবে না...'

উমার যাহাও সন্দেহ ছিল, এই শেষোক্ত কথায় তাহাও দূর হইয়া যায়। অকস্মাৎ দুঃখে, সহানুভূতিতে মন পূর্ণ হইয়া গেল। দাদার জন্ম সম্বন্ধে যে এমন কটাক্ষ করিতে পারে, তার উপর রাগে সে আগুন হইয়া আছে।

'কাকাবাবু যে এমন সেকেলে, তা আমি আগে কখনও কল্পনাও করতে পারিনি।' ড্রেসিং-টেবিলের টুলে উপবিষ্ট পাথরের মতো নির্ব্বাক নীলার কাঁধে হাত রাখিয়া উমা প্রতিবাদের কণ্ঠে কহিয়া চলিল। 'এ কি তাঁর মতো জ্ঞানী লোকের উপযুক্ত কথা! সভ্যতার পথে আমরা যখন এতটা এগিয়ে এসেচি, ঠাকুরদাদার আমলের সকল রকম কুসংস্কার একের পর আর একটা বিসর্জ্জন দিয়েচি, তখন কোন্ যুক্তিতে এই কুসংস্কারকে আঁকড়ে থাকতে পারি? মানুষের জাত ঠিক হয় তার নিজস্ব আচরণে, তার নিজস্ব কৃতিত্বে। এ যুগে কাউকে কি তার জন্মের জন্য দায়ি করে' ছোট করে রাখা যায়? অস্পৃশ্যতা কি আমরা এখনও বিসর্জ্জন দিতে পারব না?...'

যার কাছে প্রশ্ন, সেই নীলা কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করিল না। শুধু মনে হইল, তাহার প্রফুল্ল মুখটা কে যেন এক চড়ে বিষণ্ণ করিয়া দিয়াছে।

'এ আমি কিছুতেই চুপ করে' মেনে নেব না।' উমা উত্তেজনার সঙ্গেই কহিল। 'এক্ষুণি আমি কাকাবাবুর কাছে যাচ্ছি। দেখি, আমার প্রশ্নের তিনি কি জবাব দেন..তাঁর মেয়ে বলেই কি আমরা তাঁর খেলার পুতুল। আমার নিজস্ব মতামত তিনি কি করে উপেক্ষা করতে পারেন? আমার আর সহ্য হচ্ছে না। তুই বস···আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে' আসি। দেখি, তিনি কত বড় ব্যারিস্টার...' বলিয়া অধৈর্য্য ভঙ্গিতে উমা ঘর হইতে প্রায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

অতিথি-সমাগম শুরু হইয়াছে। লন্-এর সরকারি প্রবেশ-পথ দিয়া নিমন্ত্রিতেরা উৎসবস্থলে প্রবেশ করিতেছেন। নানা প্রকার মোটরের হর্ণের শব্দ শুনা যাইতেছে।

লতায় ছাওয়া ফটকের কাছাকাছি অতিথি-অভ্যর্থনার জন্য নীলাকে হাজির হইতে হইয়াছে। যথাসাধ্য মুখের চেহারা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেছে সে। শত হোক্, আজ সে হোস্টেস্; ইহারা তাহার নিমন্ত্রিত। নিজের মানসিক অবস্থা যেমনই হউক, ইহাদের প্রতি সকল প্রকার সৌজন্য দেখাইতে হইবে।

তাহার পিছনে অনুগত প্যাঁচাবাবু ফুলের ঝুড়ি হাতে লইয়া নীরব দার্শনিকের মতো দণ্ডায়মান আছেন। এক একজন অতিথি ফটক দিয়া ভিতরে ঢুকিতেছে, আর সেই ঝুড়ি হইতে এক একটি ফুলের 'বোকে' তুলিয়া নীলা সহাস্যমুখে উপহার দিতেছে। ইহারা সকলেই তাহার সঙ্গে হাসিয়া দু'চারটি কথা বলিতেছেন, অনেকেই কিছু না কিছু উপহার

দিতেছেন, এবং তারপর উৎসবক্ষেত্রের দিকে আগাইয়া যাইতেছেন। এই উপহারসমূহ নীলার হাত হইতে নীরবে সংগ্রহ করিয়া প্যাঁচাবাবু নীরবেই তাহা পিছনের টেবিলে জমা করিয়া রাখিতেছেন। কিছুক্ষণ আগে মিসেস্ পার্কিংটনও কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি অতিথিদের সঙ্গে গিয়া বসিয়াছেন।

'কত বড় হলি রে, নীলা ?'

'বুড়ি হয়ে গেছি। কুড়ি পার।'

স্বামী হাস্য করিলেন। স্ত্রী কহিলেন, 'দূর পাগ্লী! কই, বইটা দাও।...জন্মদিনের উপহার!' বলিয়া নীলার হাতে বইটা তুলিয়া দিলেন।

সম্ভ্রান্তদর্শনা, শুভ্রকেশা এক বৃদ্ধা উপস্থিত হইলেন। নীলা তাড়াতাড়ি তাকে ফুল উপহার দিল। তিনি কালো ফিতায় বাঁধা লর্‌গ্‌নেট চশমা তুলিয়া চোখে পরিয়া কহিলেন, 'কে, নীলা! ঈস্, কত বড়টি হয়ে গেছিস! দেখ তো, শাড়িটা তোর পছন্দ হয় কি না?' বলিয়া অনুসরণরত শোফারের হাত হইতে একটা শাড়ির বাক্স লইয়া তিনি নীলার হাতে তুলিয়া দিলেন।

'না, মাসিমা, এ সব কেন।' নীলা ইতস্ততঃ করিয়া কহিল।

'নিতে হয়, নিতে হয়,' বৃদ্ধা কহিলেন। 'তোর মা বেঁচে থাকলে আজ কত খুশি হতেন।...বাঃ, বড় সুন্দর কানবালা পরেচিস তো? কোন্ দোকানে কিন্‌লি ?...'

কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিলেন না। চশমা গলায় দোলাইয়া তিনি আগাইয়া গেলেন।

এইরূপ আরও বহু অতিথি আসিল। লন্-এর চেয়ারগুলির অধিকাংশই পূর্ণ হইল। আরও নূতন নূতন মোটরের হর্ণ শোনা যাইতে লাগিল।

'নীলু, এই ছাখ, জয়ন্ত এসেচে···'

নীলা ঠিক পিছন হইতে পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকাইয়া পিছনে ফিরিল। বাড়ির দিক হইতে একটি যুবককে তিনি নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন।

'দু' বছর জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে', ব্যানার্জ্জি-সাহেব কহিলেন, 'এই সেদিন মাত্র কলকাতায় বদলি হয়ে এসেচে।'

'নমস্কার। চিনতে পারচেন তো?'

'নমস্কার। ভালো আছেন?' নীলা যথারীতি প্যাচাবাবুর ঝুড়ি হইতে ফুল তুলিয়া ইহাকেও উপহার দিল।

'সভ্যতায় ফিরে এসেচি। এইবার যদি ভালো থাকি।' যুবকটি কহিল।

নিখুঁত সাহেবী-পোশাক পরা। মুখে চোখে পরিতৃপ্ত ভাব। কৃতিত্বের গর্ব্ব ও সাফল্যের পালিশ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান না থাকিলে এ ধরণটির সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। ইংরেজের রাজ্যত্যাগের পর আই, সি, এস-এর পরিবর্ত্তে যখন আই, এ, এস-নামীয় চাকরির প্রবর্ত্তন হয়, তখন যাহারা প্রথমেই এই চাকুরির জন্য মনোনীত হয়, বিখ্যাত সরকারী এটর্ণী রসময় গাঙ্গুলির পুত্র জয়ন্ত গাঙ্গুলি তাদের অন্যতম। গাঙ্গুলিরা ব্যানার্জ্জি-পরিবারের অন্তরঙ্গ না হইলেও বিশেষ পরিচিত। জয়ন্তকে নীলা অনেকবার দেখিয়াছে। কিন্তু ইহার পদোন্নতির পর ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ। চাকরি-লাভের পর জয়ন্তকে গত বছর দেড়েক বাহিরে বাহিরেই ঘুরিতে হইয়াছে। সম্প্রতি আলিপুরের অ্যাডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে ইহার কলিকাতায় আসার খবর গতকাল ব্যানার্জ্জি-সাহেবই নীলাকে জানাইয়াছিলেন।

'ওকে ছেড়োনা, নীলু।' ব্যানার্জ্জি-সাহেব পাইপ ধরাইয়া

প্রস্থানোদ্যোগ হিসাবে কহিলেন। 'চোখে চোখে না রাখলে এ আবার জঙ্গলে পালিয়ে যাবে!···তুই পাগ্‌লি কি কাজ করচিস? ও রকম মুখ করে' আছিস কেন?·· নীলু তোর বন্ধুকে ঠাণ্ডা কর। খুব চটে আছে···'সপ্রশ্রয় উচ্চহাস্য করিয়া কাছে আগাইয়া-আসা উমার পিঠে একটা সস্নেহ চাপড় দিয়া ব্যানার্জ্জি-সাহেব নিমন্ত্রিতদের দিকে আগাইয়া গেলেন।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি?' নীলা উমার দিকে ফিরিয়া প্রায় ভৎর্সনার সুরে কহিল। 'বেশ মেয়ে যা হোক। এত লোক আমি একা সামলাতে পারি?···ইনি উমা দেবী···জয়ন্তবাবু···ম্যাজিস্ট্রেট···'

'নমস্কার।' জয়ন্ত সাড়ম্বরেই নমস্কার করিল। 'আপনার বন্ধুর জন্মদিনের উৎসবে হাজির হওয়াটাকে আমিও পরম সৌভাগ্য মনে করি, কারণ এটা আমারও সভ্যতায় ফিরে আসার প্রথম উৎসব। অসম্ভব রকম আনন্দ ও গর্ব্ব বোধ করচি···'

উমা হাত জোড় করিয়া একবার কপালের দিকে উঠাইবার ভঙ্গি করিল, কোনও উচ্চবাচ্য করিল না; প্যাঁচাবাবুর মতোই মুখ করিয়া রহিল। অসম্ভব সে চটিয়া আছে। ব্যানার্জ্জি-সাহেবের উপরে, নীলার উপরে, নিজের উপরে। এবার কেতা-দুরন্ত জয়ন্ত-সাহেবও এই ক্রোধের বৃত্তের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। এত গদগদ ভাব কেন? ব্যাটাছেলের মধ্যে এই বষ্টুমি-ভাব দেখিলে গা-জ্বালা করে! নীলার সঙ্গে ভাব জমাইবার মতলব নয় তো?

ব্যানার্জ্জি-সাহেবকে সে আজ কড়া কড়া কথা শুনাইয়াছে। তিনি তর্ক করেন নাই, প্রতিবাদ করেন নাই। মিটিমিটি হাসিয়াছেন, আর "পাগ্‌লি" বলিয়া পিঠ চাপড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাতে উমা আরও চটিয়া উঠিয়াছে।

এই সময় জয়ন্তর আগমনবার্ত্তা ঘোষিত হয়। ব্যানার্জ্জি-সাহেব আগ্রহের সঙ্গেই তাকে ভিতরে আনিবার অনুমতি দেন। ইহার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তর্ক বন্ধ করিয়া অত্যন্ত বিরাগ এবং ক্রোধভরেই উমা ব্যানার্জ্জি-সাহেবের লাইব্রেরী ত্যাগ করে। নীলার উপরও তার রাগ হয়। তপন আসিবে না এবং তাহার না-আসিবার কারণ জানিবার পরও সে কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে অতিথি-অভ্যর্থনা করিতেছে!

'কাকাবাবু-কাকীমা তো এখনও এলেন না রে, উমা?' নীলা বন্ধুর দিকে চাহিয়া কহিল।

'তার আমি কি জানি।' বলিয়া উমা অতিথিবর্গের দিকে সিধা আগাইয়া গেল।

তের

রাত গভীর হইয়াছে। নীলা যথাসময়েই শুইয়া পড়িয়াছিল। তারপর দু'ঘণ্টার চেষ্টায়ও তার ঘুম আসিল না। স্নায়ুমণ্ডলী এমন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে যে, বিশ্রাম করার আশা দুরাশা মনে হইল। বহুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া নীলা বিছানা ত্যাগ করিয়া খোলা জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল। বুক ভরিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল।

সব কিছুই যেন আচম্বিতে তচনচ হইয়া গেছে। বাবাকে বুঝিতে কষ্ট হইতেছে। তাঁর মতো এমন উদার মানুষ এমন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িলেন কেন? নিশ্চয়ই তার হিতের কথাই বাবা চিন্তা করিতেছেন। তার সুখই বাবার সুখ। তাঁকে উমার মত আক্রমণ করিতে, আঘাত করিতে নীলা পারিবে না। কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের বা মতেরও সে অনুমোদন করিতে পারে না। কেন, কি ক্ষতি, কি ক্ষতি এতে? সমাজের লোক নিন্দা করিবে? সে নিন্দার আয়ু বেশি দিনের নয়। তাঁর বাবা যখন বিলাত হইতে ফিরিয়াছিলেন, তখন সেকালের সঙ্কীর্ণমনা সমাজ তাঁকে একঘরে করিয়াছিল; আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে তাঁর নিমন্ত্রণ হইত না। তাতে কি ক্ষতি হইয়াছে? ক্রমে ক্রমে সমাজের গোঁড়ামিই দূর হইয়া গেছে। যাহা যুক্তিসঙ্গত, মানবতার নিয়ম-কানুনের সঙ্গে যার বিরোধ নাই, তাহা একদিন না একদিন সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবেই। তবে আজিকার কুসংস্কারকে মানিয়া চিরকালের আলোকে বাধা দিবার চেষ্টা কেন?

জন্মদিনের অভ্যর্থনা-সভায় অসংখ্য অতিথিকে নীলা অভ্যর্থনা করিয়াছে, তাহাদের অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা সহাস্যমুখে গ্রহণ করিয়াছে, পিয়ানোতে গান গাহিয়াছে, কিন্তু ইহার কিছুই যেন সে সজ্ঞানে করে নাই। তাহার যেটা জীবন্ত দিক, সেটা একটা প্রচণ্ড আঘাতে অসাড় হইয়া গিয়াছিল। যেটা মামুলি চলন-বলনের দিক, মাত্র সেটাই সচল ছিল। এইবার সে ভয়ঙ্কর সত্যটা আবিষ্কার করিয়া শিহরিয়া উঠিল।

'নীলা!'

বন্ধ দরজায় টোকার শব্দ পড়িল। নীলা চমকাইয়া সচেতন হইল।

'নীলা, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে কেন, এখনও ঘুমোওনি?' মিসেস্ পাকিংটনের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন আসিল।

'এখুনি আবার শুয়ে পড়ব।' নীলা কহিল।

'দরজাটা খোল। নিশ্চয়ই তোমার ঘুম আসচে না। তোমার মাথায় একটু অডিকোলন দিয়ে দিই। এসব পার্টি নার্ভের উপর দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তখনই আমি লক্ষ্য করেছিলাম···'

'ঠিক আছে। আমি নিজেই দরকার হলে দেব। তুমি শুয়ে পড় গে।'

'আলোটা নিবিয়ে দাও, ডার্লিং। বিছানায় চুপ করে শুয়ে জল-প্রপাত, সমুদ্র, উঁচুনিচু পাহাড় এসবের কথা ভাবো; ঘুম এসে যাবে।'

মিসেস্ পাকিংটনের এই অতি-উদ্বেগের রঙ্গ করিতেই নীলা অভ্যস্ত। আজ সে তাহার উপদেশের প্রতিবাদ করিল না। নীরবে আলো নিবাইয়া আবার বিছানায় গিয়া শুইল।

জলপ্রপাত, সমুদ্র, উঁচু-নিচু পাহাড়ের তরঙ্গ পায়ের নিচ দিয়া পার হইয়া গেল। দ্রুতগামী কল্পনা আসিয়া পৌঁছিল পদ্মপুকুরের কাছে; আগাইয়া গেল প্রতাপ মুখুজ্জের বাড়ির বড় ফটকের দিকে। বন্ধ ফটক

গলাইয়া অনায়াসে ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। গত ছয় বৎসরের অসংখ্য স্মৃতিচিত্র চলচ্চিত্রের ছবির মতো মনের রীল্ হইতে অন্তহীন প্রবাহে বাহির হইতে লাগিল।

এই চলচ্চিত্রের অবিসংবাদী নায়ক উমার নতুন-পাওয়া দাদা।

সকালে নীলা যখন উঠিল, তখন তার চোখে-মুখে রাত্রি-জাগরণের ছাপ। মিসেস্ পার্কিংটন তাকে-তাকেই ছিলেন, ছুটিয়া আসিলেন।

'নিশ্চয়ই তুমি রাতে ঘুমোওনি। আমাকে ডাকোনি কেন?'

'ওঃ, জুজুবুড়ি, একটু থামো তো।' নীলা যথাসাধ্য স্বাভাবিক হইতে চেষ্টা করিল।

'যাও, আগে স্নান করে' নাও। বাথ্‌টবে সল্ট্ মিশিয়ে আমি জল তৈরি করে' এসেচি। অনিদ্রার অবসাদ দূর করতে স্নানের জুড়ি নাই।'

'তোমার উপদেশের চেয়ে বরঞ্চ সেটা সহ্য করা যাবে!' বলিয়া নীলা স্নান করিতে গেল।

প্রাতরাশের পর মিসেস্ পার্কিংটনকে বিবিধ অনাবশ্যক জিনিষ সওদা করিতে পাঠাইয়া নীলা নিচের লন্-এর সমুখের বারান্দায় বেতের চেয়ারে আসিয়া বসিল। নিজেই সঙ্গে করিয়া চিঠির কাগজের প্যাড্, খাম, ফাউন্টেন্ পেন্ ইত্যাদি লইয়া আসিয়াছিল। কাছের বেতের টেবিলটা টানিয়া সে চিঠি লেখায় ব্যাপৃত হইল।

'প্যাঁচাবাবু।'

কোনও সাড়া আসিল না। চিঠি খামে পুরিতে পুরিতে নীলা আরও দুই একবার ডাকিল, 'প্যাঁচাবাবু।' শেষোক্ত ভদ্রলোক যথারীতি

নীরবই রহিলেন। তিনি আশেপাশে কোথাও আছেন কিনা, তাহা জানিবার কোনও উপায়ই ছিল না, কিন্তু এবারও নীরবেই তিনি মনিব-কন্যার পিছনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

'খুব জরুরি চিঠি।' আড়চোখে একবার পিছনে চাহিয়া নীলা কহিল! 'এখুনিই চলে যান। তপনবাবুর চিঠি, বুঝেচেন? আর কারুর হাতে দেবেন না। দাঁড়িয়ে থেকে জবাব নিয়ে আসবেন...একটু জল আনতে বলুন তো, খামটা আটকাবো...'

প্যাঁচাবাবু নড়িলেন না। নীরবে একটি গদের শিশি আগাইয়া দিলেন।

অন্যদিন হইলে নীলা এই আশ্চর্য্য দূরদর্শিতা সম্বন্ধে কোনও না কোনও মন্তব্য করিত, আজ কিছু বলিল না। আঠা-মাখা তুলি বুলাইয়া খামের মুখ বন্ধ করিল।

'কথা বুঝেচেন? পদ্মপুকুরে প্রতাপ মুখুজ্জের বাড়ি যেতে হবে। তপনবাবুর হাতে এই চিঠি দেবেন। আর কেউ যেন না জানে। এখুনি জবাব আনা চাই। মোটেই দেরি করা চলবে না,' বলিয়া এইবার নীলা তার হাতে খামটি তুলিয়া দিল।

প্যাঁচাবাবু অনর্থক সময় বা বাক্য কোনটিই ব্যয় করিলেন না; শার্টের তলার ফতুয়ার পকেটে চিঠিটা পুরিয়া শের শা'র ঘোড়ার মতো চালে ডাক-বিতরণে বাহির হইয়া পড়িলেন।

চিঠির জবাব পাইতে ঘণ্টা তিনেক দেরি হইল। তপন বাড়ি ছিল না। সে বাড়ি ফিরিলে প্যাঁচাবাবু অন্যদের অজ্ঞাতসারে সুকৌশলে চিঠি তপনের হাতে পৌঁছাইয়া দিলেন। তারপর জবাব হাতে পাইতে আরও ঘণ্টাখানেক বিলম্ব হয়।

সেদিন শত চেষ্টা সত্ত্বেও মিসেস্ পার্কিংটন লাঞ্চ্ খাইবার জন্ত নীলাকে তাহার বন্ধদ্বার শয়ন-ঘর হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। তিনি উদ্বেগে সারা হইলেন। সিদ্ধান্ত করিলেন, রাত্রি জাগার ফলে নীলা নিশ্চিত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। অথচ কিছু করিবার উপায় নাই। এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা হাইকোর্টে ব্যানার্জ্জি-সাহেবের কাছে টেলিফোন করিয়া জানাইবেন কিনা, স্নেহময়ী বৃদ্ধা তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

নীলা তপনের চিঠিটা ইতিমধ্যে কয়েকবার পড়িয়াছে। আরও একবার উঠাইয়া পড়িল :—

"…তোমার সাথে আর দেখা না হওয়া বোধ হয় সবার পক্ষেই মঙ্গলের হবে। জীবনে সেন্টিমেণ্টের কোনও দাম নেই, নীলা। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে মানুষের সকল স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়।…ভেবে দেখো তো, সত্যই কি আমার কোন পরিচয় আছে? প্রতাপ মুখুজ্জেমশায়ের আমি পালিত-পুত্র, সমাজে এটা একটা পরিচয়ই নয়। এ পরিচয়কে সমাজ স্বীকার করে না। · কিন্তু যে পরিচয় গ্রাহ্য, তা আমি কোথা থেকে সংগ্রহ করি বলো? অর্থ, আভিজাত্য, খ্যাতি এসব তো দূরের কথা, আমার একটা জন্ম-পরিচয়ও নেই। এই দুর্লঙ্ঘ্য বাধা পার হয়ে আমার পক্ষে কি ভদ্রসমাজে পৌছান সম্ভব? অভিজাতের দরবারে হাজির হতে চাইলে দারোয়ানের হাতে অপমানিত হয়ে দরজা থেকেই আমাকে ফিরে আসতে হবে। সে চেষ্টা করব না।…কিন্তু মানুষের সমাজ তো অতটুকুই নয়। তার বৃহত্তর অংশ তোমাদের এই সমাজের বাইরে। সেখানে মানুষে মানুষে তফাৎ নেই। সেখানে মানুষ জনতা। আমি এই জনতারই একজন। কিন্তু এই জনতা তাচ্ছিল্যের নয়।

এরা যেদিন সচেতন হয়ে উঠবে, নিজের শক্তি, নিজের ভূমিকা, নিজের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হবে, সেদিন এদের স্বার্থ-অনুসারেই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হবে, পৃথিবী নতুন ছাঁচে গড়া হবে। এদের দাবি, এদের প্রয়োজনের তাগিদ রোধ করবার শক্তি কারুরই থাকবে না। জনতার আসন উর্দ্ধে উঠবে। আর সে তাচ্ছিল্যের থাকবে না।...আমাদের মতো পরিচয়- হীনদের পক্ষে এর চেয়ে বড়ো আদর্শ, বড় সম্ভাবনা আর নেই।...এই অনাগত উন্নতির আশায় জনতার ভাগ্যের সাথে নিজের ভাগ্য আমি জড়িয়ে নিয়েছি।...রবীন্দ্রনাথের "স্বর্গ হতে বিদায়" কবিতাটি পড়েছ? পড়ে দেখো। কবিতাটির কথাগুলি আজ কেবলই মনে পড়চে।...যারা পরবাসী, তাদের স্বর্গ থেকে দূরে থাকাই ভালো। যদি কোন অপরাধ করে' থাকি, ক্ষমা করো। সুখী হও..."

এতক্ষণ পরে নীলা সংযম হারাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

চৌদ্দ

জয়ন্তের যাতায়াত সহসা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথম কয়েক দিন ব্যানার্জ্জি-সাহেবের সঙ্গেই আসিয়াছে; এখন নিজেই সরাসরি আসিতেছে।

নীলাকে আতিথেয়তা করিতে হয়; চা-পরিবেশন করিতে হয়। গানের জন্য দাবি ওঠে।

ইদানীং মিসেস্ পার্কিংটনও জয়ন্তকে বিশেষ খাতির করিতেছেন। তার মুখের হাসি এবং চোখের চাওয়া ইঙ্গিতগর্ভ। নীলা আভাসে ব্যাপারটা অনেকটা বুঝিতেছে।

একদিন ব্যানার্জ্জি-সাহেব স্পষ্টই তাহাকে বলিলেন।

রবিবারের ছুটিটা তিনি লাইব্রেরীতেই কাটাইয়াছেন। বই পাইলে আর কোনও দিকেই তাঁর ভ্রূক্ষেপ থাকে না। তখন তাঁর খাওয়া-নাওয়ার ভারও অন্যেদের নিতে হয়।

ঘড়ির কাঁটাতে ঠিক চারটে বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের সরঞ্জামবাহী বেয়ারাসহ নীলা বাবার কাছে হাজির হইল।

'চায়ের সময় হয়ে গেল বুঝি? আঃ!' বলিয়া বানার্জ্জি-সাহেব বই সরাইয়া তৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিলেন।

সামনের টিপয়ে কোজি-ঢাকা চায়ের পট্ ও পেয়ালা ইত্যাদি বিবিধ সরঞ্জাম স্থাপিত হইল। প্লাম্ কেকের প্লেটটা নীলা নিজেই নামাইল।

'আমি কিন্তু চা ছাড়া আর কিছু নয়, নীলু-মা।' নিটোল কেকের দিকে একবার তাকাইয়া ব্যানার্জ্জি কহিলেন।

'এটা আমি নিজে বানিয়েছি, বাবা।' নীলা পেয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে কহিল।

'তবে তো খেতেই হবে! ভারি স্থন্দর দেখতে হয়েচে তো!' ব্যানার্জ্জি-সাহেব সস্নেহে কহিলেন।

পিতা-পুত্রীতে চা পান চলিল।

'জয়ন্ত আসবে?'

'জানিনে'

'বড়ো ভালো ছেলেটি।' ব্যানার্জ্জি কহিলেন। 'বিনয়ী, ভদ্র, শিক্ষিত। ওর বাবার সঙ্গে আমার অনেক কালের বন্ধুত্ব।...হ্যাঁ রে, নীলু, এক কাজ করলে হয় না। আমি ভাবচি, ওকে তোর বর করে' দিলে কেমন হয়...'

নীলা নীরবে বাবার পেয়ালায় আর কিছুটা চা ঢালিয়া দিল।

'কিছুদিন ধরেই কথাটা আমি ভাবচি,' ব্যানার্জ্জি-সাহেব কহিলেন। 'তোর মা বেঁচে থাকলে এসব আমাকে ভাবতে হ'তো না। সেই এ ভাবনার ভার নিজের কাঁধে নিতো। কিন্তু সব ভার ত্যাগ করে সে ভারমুক্ত হয়েচে।...সব দিক থেকেই এরা ভালো ঘর। বনেদী বংশ, বনেদী ক্রিয়াকর্ম্ম। রসময় ভালো লোক। আর ছেলেটিকেও আমার চমৎকার লাগচে।...বৈবাহিক সম্বন্ধ করতে হলে সব দিকই ভেবে দেখতে হয়...'

ইঙ্গিতটা নীলা লক্ষ্য করিল, কিন্তু কোনও উচ্চবাচ্যই করিল না।

'মানুষের জীবন, কবে আছি, কবে নেই, তার কিছুই ঠিক নেই। কেমন যেন ক্লান্ত বোধ করছি।...সময় থাকতে আমি সব ব্যবস্থা করে' যেতে চাইরে, নীলু। রসময়ও ধরে' পড়েচে। তাকে কথা দিয়ে ফেলি, কি বলিস্?...'

'এখন থাক, বাবা।' এইবার নীলা কহিল।

'সে তো আমিও চাই রে। যতদিন তোকে কাছে রাখতে পারি, সে তো আমারই লাভ।' ব্যানার্জি-সাহেব সস্নেহে কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন। 'তুই চলে গেলে এই বাড়ির আর কোন্ আনন্দ অবশিষ্ট থাকবে? কিন্তু ইচ্ছে করলেই কি আর দেরি করা যায় রে। ও পক্ষের ইচ্ছারও তো সম্মান করতে হবে। তা সে যাই হোক, আজই যে কথা দিতে হবে, এমন নয়। তবে বেশি দেরি আমিও করতে চাইনে।...আমি তোর ভালো করতেই চাই, চাইনে রে, নীলু মা?...'

'হ্যাঁ, বাবা। তোমার মতো বাবা ক'জন পায়।'

'তবে দে,' ব্যানার্জি-সাহেব সহাস্যে কহিলেন, 'আর এক টুকরো কেক্ দে। ভারি চমৎকার তৈরি করেছিস...'

ইহার পর দিন পনেরো-কুড়ি কাটিয়াছে। জয়ন্ত এ-বাড়িতে যথেচ্ছ আসার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। নীলার জন্মদিনের উৎসবের পর হইতে উমা আর আসে নাই। দুই সখীর টেলিফোন-আলাপও বন্ধ হইয়াছে। মুখুজ্জে-পরিবার যেন নীলার কাছ হইতে অনেকটা দূরে সরিয়া গেছে।

নীলা খুব বড়ো মেয়ে নয়। তার বিচার-বোধে এখনও পরিপক্বতার রং লাগে নাই। নিজের ইচ্ছার এবং হৃদয়বৃত্তির সার্ব্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিবার মতো মানসিক জোর এখনও তার আয়ত্ত হইতে দেরি আছে। এই অবস্থায় সে যে জটিল মনস্তাত্ত্বিক সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছে, তাহার সমাধান করার মতো দক্ষতা তার নাই।

বাবাকে সে আঘাত করিতে পারে না। বাবার বিচার তার মনঃপূত না হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা সে ভাবিতে

পারে না। এক উপায় ছিল তপন। তাহার পরামর্শ লইয়া কিছু করা যাইত। সে কাছে আসিলে হয় তো অভাবনীয় কিছু করিবার সাহস হইত নীলার। কিন্তু নীলার আমন্ত্রণ সে কঠিন ভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তপনের স্বভাবে পুনর্বিবেচনার স্থান নাই। নীলা এই কথাটা ভালো ভাবেই জানে।

একটা আহত অভিমানে নীলার কিশোরী-মন পূর্ণ হইয়াছে। মুখুজ্জে-বাড়ির খবর লইবার মতো কৌতূহলও তার অবশিষ্ট ছিল না।

নিচতলার প্রকাণ্ড খানা-কাম্‌রায় প্রাতরাশ দেওয়া হইয়াছে। উজ্জ্বল প্রভাত; বাগানের গাছপালা খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে। ব্যানার্জ্জি-সাহেব খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে চা খাইতেছেন।

একটি খবরের প্রতি তাঁহার কৌতূহল নিবদ্ধ হইয়াছে।

তপনের একটি আবক্ষ প্রতিকৃতি একটি সংবাদ-স্তম্ভের মধ্যস্থলে ছাপা। যুব-সমিতির উদ্যোগে হাজরা পার্কে বস্তিবাসীদের এক বড়ো সভা হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ছাত্র-নেতা তপন মুখার্জ্জি সভাপতিত্ব করে। সংবাদটি তাহারই বক্তৃতার সারাংশ। উৎসুক হইয়া ব্যানার্জ্জি-সাহেব রিপোর্টটি পড়িলেন।

বস্তিগুলিকে আক্রমণ করিয়া তপন বলিয়াছে: এগুলি সভ্যতার কলঙ্ক; আমাদের ধনতান্ত্রিক সমাজের মূর্ত্তিমান কুফল। মানুষকে মানুষ কত হীন করিয়া রাখিতে পারে, তাহার বর্ব্বর নিদর্শন! কি ধরণের জীবন এখানে যাপন করা হয়, কি দুর্দ্দশা মানুষ ভোগ করে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়া সে বলিয়াছে:—মহাত্মা গান্ধী যেমন লবণ-আইন ভঙ্গকে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতীক করিয়াছিলেন,

তেমনি স্বার্থপর সমাজ-ব্যবস্থার অবসানের প্রতীক হিসাবে বস্তি-উচ্ছেদ আন্দোলন চালাইতে হইবে। দরিদ্র নগরবাসীর জন্য ভদ্র ও পরিষ্কার বাসস্থানের দাবি সম্বন্ধে স্বদেশী গবর্ণমেণ্টকে সচেতন করিবার জন্য শীঘ্রই শহরের বস্তিবাসীদের এক মিলিত শোভাযাত্রা বাহির করা হইবে, বক্তৃতায় তাহাও তপন জানাইয়াছে।

কাগজটা মুড়িয়া ব্যানার্জ্জি-সাহেব এক ধারে রাখিলেন।

'বাবা, তোমাকে আর এক কাপ চা দেব?'

'না, মা। আর চাইনে। এবার আমি উঠব। আজ তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে।' বলিয়া বানার্জ্জি উঠিয়া পড়িলেন। 'জয়ন্ত আজ রাতে খাচ্চে, তোর মনে আছে তো, নীলু, মা? আটটায়।'

'আছে।'

ব্যানার্জ্জি-সাহেব একবার মেয়ের দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। কেমন যেন রোগা হইয়া গিয়াছে মেয়েটা। অল্পদিনের মধ্যে ভারি গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে।

'তোর ওপর কোন রকম,' ব্যানার্জ্জি-সাহেব সামান্য দ্বিধা করিয়া কহিলেন, 'মানে, তোকে কোনও রকমে আমি পীড়া দিচ্ছিনে তো, নীলু মা?...'

'না, বাবা।'

'বড্ড যেন রোগা হয়ে যাচ্ছিস।'

'না তো।'

ব্যানার্জ্জি-সাহেব আর কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। আরও দু'এক সেকেণ্ড দ্বিধা করিয়া তিনি ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

নীলা উঠিল না। চুপ করিয়া কিছুক্ষণ খাওয়ার টেবিলেই বসিয়া রহিল। খবরের কাগজ সে আগেই পড়িয়াছে। ফটো এবং মিটিংয়ের

বিবরণী আগেই দেখিয়াছে। ইংরেজি এবং বাংলা দুই কাগজেই। তবু টেবিলের উপর হইতে ভাঁজ-করা খবরের কাগজটা তুলিয়া আবার সে সেই বিশেষ জায়গাটা খুলিয়া লইল।

'নীলা ?'

নীলা চম্‌কাইয়া সমুখে তাকাইল। দেখিল, তার অনেক দিন না-দেখা বন্ধু উমা তার অজ্ঞাতসারেই একেবারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'বস। চা দেব

'মনে আছে, কত দিন ধরে যাস্ না !' উমা পাশের চেয়ারে বসিয়া কহিল। 'চা তো চা, জল-স্পর্শও করব না।'

'তুইও তো আসিস্ নি···

'কেন আসব ?' উমা কহিল। 'তুই কি আর এখন আমাদের আপনার লোক বলে মনে করিস ? আজকাল তোদের সব নতুন বন্ধু-বান্ধব হয়েচে! আমরা কোথাকার কে।···তবু আসতে হলো। গরজ বড় বালাই।···দাদার খবর রাখিস কিছু ? ক্ষেপে গেছে সে। পাগল হয়ে উঠেচে। বাড়ি ছেড়ে বস্তিতে গিয়ে আছে। মিটিং করচে, বক্তৃতা দিচ্চে, ধর্ম্মঘট করাচ্চে, পিকেটিং করাচ্চে। মা ভেবে ভেবে একশেষ হচ্চেন। কিন্তু যার জন্য দুশ্চিন্তা, তাকে বোঝায় কার সাধ্য ! এবার বাকি জেলে যাওয়া। সে-ও যে কোনও দিনই ঘটতে পারে···'

নীলা কোনও সাড়া দিল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

'তুই কি বুঝিস্ নে,' উমা কহিতে লাগিল, 'সে কতটা আঘাত পেয়েচে ! সে কি রকম সম্মানী, কি রকম একরোখা মানুষ, তুই তো জানিস্। কই, তুই তো একবারও তাকে ডাকিস্ নি। তবে তুইও কি কুসংস্কারে বিশ্বেস করিস্ ? আমরা সবাই যদি জোর করে' ধরি, তবে

কাকাবাবুই কি আমাদের সকলকার দাবি ফেলতে পারবেন? কিন্তু তুইই যদি এমন চুপ করে থাকিস্, তবে দাদাকেই কি কাছে আনা যাবে? কাকে নিয়ে আমরা লড়াই করব? একবার তাকে জোর ক'রে ডাক্। কিছুতেই সে না এসে থাকতে পারবে না।···সে তো সে ধরণের পুরুষ নয়, যারা মেয়েদের পায়ে আত্মসমর্পণ করেই আছে। এ যে মহাদেবের জাত! একে আরাধনা করে' জয় করতে হয়, নীলা···'

নীলা একবার উমার দিকে চাহিল, কিন্তু একটি কথাও উচ্চারণ করিল না।

'ওরে বোকা বোবা মেয়ে, অন্তত একটা কথা বল।···'

'কি বলব? কি বলার আছে।' নীলা অস্ফুট কণ্ঠে কহিল।

'তাকে একবার কাছে ডাকতে তো পারিস্...'

'ডাকলে তিনি শুনবেন কেন?'

'অন্তত একবার ডেকে দেখ্ তো··'

'ডেকে দেখেছি। কোন ফল হয় নি। নিজেকে আর আমি ছোট করতে পারব না।···চল, উমা, ওপরে গিয়ে বসি।' বলিয়া নীলা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এ প্রসঙ্গের উপর যেন যবনিকা টানিয়া দিল।

পনেরো

বাড়ির সামনের লন্‌-এ সন্ধ্যাবেলা কিছুক্ষণ একা পায়চারি করা ব্যানার্জ্জি-সাহেবের নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাস। স্বাস্থ্য অর্জ্জন ও রক্ষার জন্য ঐটুকুমাত্রর বেশি শরীর-চর্চ্চার সময় পান না। কিন্তু ঐটুকু নিষ্ঠার সঙ্গেই তিনি পালন করিয়া থাকেন।

আজও করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া প্রকাণ্ড লন্‌-এর মধ্য দিয়া আড়াআড়ি ভাবে তিনি যাতায়াত করিতেছেন। মুখে জলন্ত পাইপ্‌। ডিনারের পোষাক পরা। অন্যমনস্ক ভাব।

এই প্রাত্যহিক অভ্যাসটি শুধু যে তাঁর অঙ্গসঞ্চালনের সহায়ক তাহাই নয়, ইহা যেন তাঁহার বহুচিন্তা-ভারাক্রান্ত মস্তিষ্কের ভারও কিছুটা হাল্কা করিয়া দেয়। খোলা হাওয়ায় খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করিয়া যাইবার পর তিনি অনেক সহজভাবে নতুন চিন্তার ভার মাথায় লইতে পারেন।

আজও পায়চারি করিতে করিতে তিনি ভাবিতেছেন।

উমা তাঁকে ভাবাইয়া তুলিয়াছে। উমা নীলার অভিন্নহৃদয় সখী; যে কথা পিতা হইয়া তাঁর জানিবার উপায় নাই, বন্ধু উমার পক্ষে অনায়াসেই তা জানা সম্ভব। নীলা নাকি তার বাবার উপর অভিমান করিয়াছে! প্রচণ্ড অভিমানে সে মুখ বুঁজিয়া আছে। প্রতিবাদের একটি ছোট কথাও উচ্চারণ করে নাই।

একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ব্যানার্জ্জি নিজেও লক্ষ্য করিয়াছেন। নীলা আর আগের মতো চঞ্চলা কলহাস্যময়ী মেয়ে নাই। অত্যন্ত অকস্মাৎ যেন তার বয়স এবং গাম্ভীর্য্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন এতই স্পষ্ট যে,

ব্যানার্জি-সাহেবের মতো উদাসীন ব্যক্তির দৃষ্টিও তাহা এড়াইতে পারে নাই। এই ভাবান্তর তাঁহাকেও ভাবাইয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু অভিমান কেন? নীলা যাহা চায় না, তাহা কি জোর করিয়া তিনি কখনও উহার ঘাড়ে চাপাইতে পারেন। যদি নীলার কোনও বক্তব্য থাকে, পছন্দ-অপছন্দ থাকে, তবে নীলা আসিয়া তাঁহাকে বলে না কেন? তিনি কি কখনও তার কোনও আব্দারই উপেক্ষা করিয়াছেন?

আজ সকালেই তিনি এই প্রতিবাদের অবকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তোকে কোনও রকমে আমি পীড়া দিচ্ছিনে তো, নীলু-মা? নীলা সংক্ষেপে ইহার জবাব দিয়াছিল, না, বাবা। কিন্তু ইহাই কি সব? বড় ভাবনায় ফেলিয়াছে মেয়েটা। নীলার মা বাঁচিয়া থাকিলে কত নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত। মেয়ের মনের কথা জানিয়া লওয়া মার পক্ষে অতি সহজ। অথচ ব্যানার্জি-সাহেবের পক্ষে তাহা কত বড় দুরূহ তত্ত্ব!

এক মিসেস্ পার্কিংটনের সহায়তায় জানিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে কিছু লাভ হইবে কি? মনের কথা নীলা আর যাকেই বলুক, মিসেস্ পার্কিংটনকে বলিবে না, ইহা নিশ্চিত।

কিন্তু তিনি নিজেই বা স্পষ্ট তাকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন? এইখানেই তো মুস্কিল! জেরা করিয়া গোপন-তথ্য টানিয়া বাহির করিতে তাঁর জুড়ি নাই। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় অভিমানিনী কন্যার মনের কথা বাহির করিবার চেষ্টা অত্যন্ত অসঙ্গত দুশ্চেষ্টা হইবে না কি?

উমার সিদ্ধান্ত অবিশ্বাস করিবারই বা কি কারণ থাকিতে পারে? তপন নীলার আশৈশব সহচর। তপন সুপুরুষ। তপন কৃতী ছাত্র। তপন ব্যক্তিত্বশালী। মুখুজ্জে-পরিবার নীলার পরমাত্মীয়। এই

পরিবারের পুত্র-কন্যা দুটি নীলার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ সবই ব্যানার্জ্জি খুব ভালো ভাবে জানেন। তপনকে বিয়ে করিতে নীলার আপত্তি হইবে না, এটাও তিনি অনায়াসে ধরিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর আপত্তির কারণ অন্য।

তপনের পিতৃ-পরিচয় নাই। কে জানে কোন্ অগৌরবের মধ্যে তার জন্ম হইয়াছে। কে জানে, কোন্ কলঙ্ক তার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত! তার জন্ম-ইতিহাস রহস্যে আবৃত। কি করিয়া তিনি জন্ম-পরিচয়হীন ছেলেকে নিজের একমাত্র কন্যার স্বামী হিসাবে নির্ব্বাচন করিবেন? তার এই আপত্তি কি ছেলেমানুষি? ইহাকে কি কুসংস্কার বলা চলে? নীলা এই আপত্তির সারবত্তা বুঝিবে, ইহাই তিনি আশা করিয়াছেন। কিন্তু হিসাবে কোথায় যেন গোলমাল রহিয়া গেছে।

অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করিতে করিতে ব্যানার্জ্জি-সাহেব ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত যদি নীলার এতই অপছন্দ হইয়াছে, তবে সে একবার আসিয়া প্রতিবাদ করিল না কেন? লজ্জা করিয়াছে? ভয় করিয়াছে? অভিমান হইয়াছে?

'অভিমান কেন?' উমাকে ব্যানার্জ্জি-সাহেব প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

'নয় কেন?' উমা জবাব দেয়। 'একবারও কি আপনি তাকে পছন্দ-অপছন্দের কথা জিজ্ঞেস করেচেন? আপনার যা পছন্দ, তাই তার কাছে হাজির করেচেন মাত্র।'

কথাটা সত্য। তিনিই জয়ন্তকে পছন্দ করিয়া আনিয়াছেন। মেয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করেন নাই। ধরিয়া লইয়াছেন, হিতাকাঙ্খী পিতা যাকে পছন্দ করিয়াছেন, মেয়ে স্বভাবতই তাকে পছন্দ করিবে।

নীলা যে এত বড়টি হইয়া উঠিয়াছে, তা তিনি টের পান নাই।

ব্যানার্জ্জি-সাহেব লন্ ত্যাগ করিয়া বারান্দায় উঠিলেন।

রাত আটটা বাজার মিনিট দশেক বাকি আছে। নীলা দোতলার সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া আসিতেছে। সাজ-পোশাক অতিথি-অভ্যর্থনার উপযুক্ত। মুখে কোনওরূপ ভাবলেশ নাই। একতলার বারান্দার ঘড়ির দিকে একবার সে উদাসীন দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, তারপর খুব ধীরে ধীরেই নিচে নামিতে লাগিল।

গাড়ি-বারান্দায় একটা গাড়ি থামার আওয়াজ শুনিয়া নীলা আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল। আটটায় জয়ন্তের ডিনারের নিমন্ত্রণ। তাহার আসিবার সময় হইয়াছে বৈকি।

'নীলা!'

নীলা চম্‌কাইয়া চাহিল। মুহূর্তে উমার উদ্বেগপূর্ণ মুখ নজরে পড়িল। সকালে যাহার আকুতি নীলা উপেক্ষা করিয়াছে, সন্ধ্যায় আবার সে আবেদন লইয়া আসিবে কেন? উমার কি একটুও রাগ নাই? কেন সে উপযাচিকা হইয়া আসিবে? উমার এই কাঙালপনায় নীলার কান্না পাইয়া যায়। উমা তাহাকে সজোরে আঘাত করিলেই সে যেন বাঁচিত।

'দাদাকে পুলিসে ধরে' নিয়ে গেছে, নীলা। শীগগির আয়। উমা ঝড়ের মতো কাছে আগাইয়া আসিল। 'আমি থানা থেকে ছুটে এসেচি তোকে নিয়ে যেতে।...'

নীলা কোনও সাড়া দিল না। সিঁড়ির যেখানে ছিল, সেখানেই নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল।

'চল্, নীলা। আর দেরি নয়।' উমা বিপন্নভাবে কহিল। 'আমাকে কাছে ডেকে বল্লেন, নীলাকে অনেক দিন দেখিনি, সে কেমন আছে?...এই তার ডাকার ধরণ। চল, নীলা, বিপদের সময় আর অভিমান করে' থাকিস নে...'

নীলা পাথরের মূর্ত্তির মতো নিশ্চল রহিল। জবাব দিল না, নড়িল না; এমন কি, ভাব-প্রকাশও করিল না।

'এ খবর শুনে তবুও দাঁড়িয়ে রইলি!' উমা অধৈর্য্য সবিস্ময়কণ্ঠে কহিল। 'ওঃ, বুঝেচি। বেশ। ঠিক আছে। এইবার সব বুঝতে পেরেচি। বুঝতে পেরেচি, আমাদের কাছ থেকে তুই কত দূরে সরে' গেছিস্! কিন্তু আর নয়, আর দেরি করতে পারিনে।··· মিছিমিছি এতটা সময় নষ্ট করলুম। ফিরে গিয়ে হয়তো আর দেখতেই পাব না ..'

যেমন ঝড়ের মতো আসিয়াছিল, তেমনি দ্রুত উমা ছুটিয়া বাহির হইল।

ব্যানার্জ্জি-সাহেব যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, তখনও নীলা নিশ্চল হইয়া সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া আছে। আসিতে আসিতে হল-ঘরের দরজার কাছেই থামিয়া গিয়া আদ্যোপান্তই ব্যানার্জ্জি শুনিয়াছেন। এইবার নীলার বিবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। যেন একটা নিষ্প্রাণ মোমের পুতুল সিঁড়ির মাঝপথে দাঁড়াইয়া দৃষ্টিহীন চোখে শূন্যের দিকে চাহিয়া আছে। শুধু দুই ফোঁটা চোখের জল তার দুই গালের উপর চক্‌চক্ করিতেছে।

'নীলা'

'বাবা!'

'তুই গেলি নে উমার সঙ্গে?'

নীলা একবার দেওয়াল-ঘড়ির কাঁটার দিকে চাহিল। কহিল, 'আটটা বাজে। জয়ন্তবাবুর আসার সময় হয়েচে। আমি এখন যাব!...'

ব্যানার্জ্জি-সাহেব যেন মার খাইলেন। এত বড় অভিমান! নিজেকে পিষিয়া তার ইচ্ছা পালন করিতে হইবে, এমন দাবি তিনি কবে করিয়াছেন?

'হ্যাঁ, যাবি বৈকি।' ব্যানার্জ্জি স্পষ্ট কণ্ঠে কহিলেন। 'তোর না গেলে চলবে কেন। এর চেয়ে বড় আর কোনও কর্ত্তব্য নেই।... ড্রাইভার, ড্রাইভার...'

হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুতের ধাক্কা খাইয়া নীলা নড়িয়া সজীব হইয়া উঠিল। সে ছুটিতে লাগিল। 'ড্রাইভার! ড্রাইভার! প্যাঁচাবাবু...' সুউচ্চ, অসহিষ্ণু ডাকে সারা বাড়ি মুখরিত হইল। দেওয়ালে দেওয়ালে, লন্ ও বাগানের পথে এই ডাক ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ষোল

ইহাই রাণীদেবী আশঙ্কা করিতেছিলেন। তাঁহার আশঙ্কা সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। যুব-সমিতির পক্ষ হইতে বস্তি-সমস্যার প্রতি সরকারের দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্য আগামীকাল এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিবার আয়োজন চলিতেছিল। তপন ইহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা।

গত পনেরো দিন ধরিয়া সে বাড়ি আসে না। বস্তিতে বস্তিতে ঘুরিয়া বস্তির অধিবাসীদের কাছ হইতে সে উহাদের অভাব-অভিযোগ শুনিতেছে, বস্তির জীবনযাত্রা লক্ষ্য করিতেছে, বস্তির মালিকেরা কি পরিমাণ আয় করে এবং কি পরিমাণ সুবিধার ব্যবস্থা করে তার হিসাব লইতেছে। বাড়ি আসিবার তার ফুরসৎ নাই। হয়তো ইচ্ছাও নাই, রাণীদেবী আশঙ্কিত হইয়া ভাবেন। তাহার জন্য বাড়ির অন্যেরা পুলিশের হাতে হয়রাণ হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বাড়ি হইতে সে দূরে থাকিতেই চায়।

এমন সময় থানা হইতে টেলিফোন আসিল। তপন গ্রেপ্তার হইয়াছে। স্বামী এবং কন্যাসহ রাণীদেবী মরিয়ার মত ছুটিয়া গেলেন।

এইবার নিরস থানার ঘর জীবন-রসের সঞ্চারে জীবন্ত হইয়া উঠিল। মায়ের চাপা কান্না এবং অনুযোগ, থানার কর্ম্মচারিদের সঙ্গে প্রতাপবাবুর উদ্বিগ্ন আলোচনা এবং থানা-অফিসার ও অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পুলিশ-কমিশনারের সলাপরামর্শে নাটকীয় তীব্রতা আত্মপ্রকাশ করিল। কিন্তু যাহাকে লইয়া এত আলোচনা, সে একটুও উত্তেজনা প্রকাশ করিল না।

অবশেষে থানা-অফিসার রাণীদেবীকে বিশেষ খাতির দেখাইয়া কহিলেন, 'দেখি, একটা মুলচেকা দিলে ছেড়ে দিতে পারি কিনা। কেস্‌টা ঠিক আমার হাতে নয়...পোলিটিক্যাল্‌ কেস্‌...'

'এতে দোষ কি, তপন?' রাণী পুত্রের দিকে ভীরু-চোখে চাহিয়া বলিলেন। 'তুই তো আর সত্যিই দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতিস্‌ নে...'

তপন একবার করুণদৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাহিল। কহিল, 'দাঙ্গার আয়োজন করচি, এই অভিযোগে তো এরা আমাকে গ্রেপ্তার করেন নি; শোভাযাত্রা বের হলে দাঙ্গা বাধতে পারে, এই ভয়ে গ্রেপ্তার করেচেন। শোভাযাত্রা বের হলেই দাঙ্গা বাধবে, পুলিশ এটা কেন স্বতঃসিদ্ধ বলে' মনে করবে? তা হলে তো কোনও কিছুর বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানান যাবে না!...'

'এরা বলছেন,' এবার প্রতাপবাবু নিজেই বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, 'এর পেছনে আরও বড়ো ষড়যন্ত্র আছে। যারা সমাজকে বিপন্ন করতে চায়, এটা তাদেরই একটা লোক-দেখানো প্রতিবাদ। এই শোভাযাত্রা অবলম্বন করে' এরা নিজেদের সমাজধ্বংসী কার্য্যকলাপ বাড়াবার মতলবে আছে...'

'এসব মামুলি কথা।' তপন রাণীদেবীর দিকে চাহিয়াই এর জবাব দিল। 'নিজেদের কাজের সাফাই হিসেবে পুলিশ সর্ব্বদাই এ কথা বলে থাকে। আমাদের উদ্দেশ্য আমরা গোপন রাখিনি। সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থা—যাতে মুষ্টিমেয় লোক মাত্র আরামে থাকতে পারে, আর অবশিষ্টকে পশুর জীবন যাপন করতে হয়, তাকে পাল্টানোই আমাদের উদ্দেশ্য। সমাজের অগণিত লোকের হিতের জন্য সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করতে হবে। কিন্তু সেটা একদিনে সম্ভব নয়। বহুদিনের চেষ্টায় জনমত গড়ে তোলা হয়। সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়লাভ করতে

৮

হলে জনসাধারণকে এ বিষয়ে শিক্ষিত করতে হবে। একমাত্র তবেই ইংলণ্ডের মতো শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তন সম্ভব।…কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলতে গেলেই, লোকের কাছে নতুন চিন্তাধারা উপস্থিত করলেই প্রচলিত-ব্যবস্থার রক্ষক হিসেবে পুলিশ যদি ক্ষেপে ওঠে, তবে স্বাধীনতাই বা কোথায় আর সমাজব্যবস্থার সংস্কারই বা কি করে' সম্ভব? এই সংস্কার তাড়াতাড়ি না করলে সারা সমাজেই হয়ত একদিন আগুন জ্বলে উঠবে। পুলিশের বুট দিয়ে কি আগ্নেয়গিরি চাপা দেওয়া যায়…কিন্তু এরা আমার সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করেচেন, ব্যক্তিগতভাবে এদের ওপর আমার কোনও অভিযোগ নেই।…ছি, তুমি কেঁদো না, মা। আদর্শের জন্য মাত্র ক'বছর আগেও তো আমাদের দেশে শত শত কংগ্রেসকর্ম্মী জীবন বিসর্জ্জন দিয়েচেন! আমি কি এতটুকুও পারব না। তুমি যে আমাকে বড় হবার এমন অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়েছ, তবে তার অসম্মান হবে যে…'

রাণীদেবী পুত্রের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

এমন সময় উমা ফিরিয়া আসিল। থানায় পৌছিবার দু'মিনিটের মধ্যেই সে নীলাদের বাড়ি ছুটিয়া গিয়াছিল। বলিয়া গিয়াছিল, নীলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। ফিরিয়া আসিল একাকী।

তপন একটু যেন হতাশ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই এই ভাবটি দূর করিয়া সে হাল্কা গলায় কহিল, 'খুব মজা হলো, না রে উমা? এইবার চুপচাপ কিছুদিন ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে। তুই না বিশ্রাম করতে বলতিস্। তোর কথা কখনও ফেলতে পারি?'

'দাদা, নীলা এলো না।' উমা তপনের প্রায় কানে কানে কহিল।

তপন এ সম্বন্ধে কোনই মন্তব্য না করিয়া দারোগাবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, 'এইবার তবে আমাকে নিয়ে যেতে বলুন।'

দারোগাবাবু এই অনুরোধ রক্ষায় অযথা বিলম্ব করিলেন না। তাহার ইঙ্গিতে দুইজন কনেষ্টবল নিঃশব্দে তপনের দুই পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

'হাজতে নিয়ে যাও।' দারোগাবাবু সরকারিভাবে আদেশ করিলেন।

সহসা সদর-দরজার মুখে জুতার দ্রুত ও তীক্ষ্ণ আওয়াজের সঙ্গে ভীত নারী-কণ্ঠের প্রশ্নে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইল। আঁচল উড়াইয়া, বেণী দোলাইয়া, উদ্বিগ্ন উত্তেজিতমুখে এক অতিসম্ভ্রান্তদর্শন কিশোরী প্রায় ছুটিতে ছুটিতে ভিতরে আসিয়া ঢুকিল।

তপন অস্ফুটস্বরে কহিল, 'নীলা!'

নীলা কাছে আগাইয়া আসিল। দুই চোখ সজল; ওষ্ঠ কম্পমান। চোখে অপরাধীর দীন ভাব।

'এ কেন করলেন?' চোখ তুলিয়া নীলা ধীরে প্রশ্ন করিল।

'কি করলাম, নীলা?' তপন কহিল। 'কোনও অন্যায় তো করিনি। নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখেছি, এ কি আমার অপরাধ?...'

'আমি কোনও অন্যায় করিনি তো?' নীলা সজলকণ্ঠে কহিল।

'কায়েমি স্বার্থের পাপ সভ্যতার সমবয়সী', তপন স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, 'এর জন্য তুমি দায়ি হতে যাবে কেন। তবে তোমারও কাজ আছে; সমাজ থেকে সব রকম অন্যায় অসাম্য দূর করার জন্য সবাইকেই চেষ্টা করতে হবে। এই সচেতন যুগের সেটাই যুগধর্ম্ম...যাও, মার কাছে যাও। তাঁর কাছে বেশি করে থেকো। তাঁকে সান্ত্বনা দিও। আমি এখন যাই...' বলিয়া তপন সহসা সমুখ দিকে পা বাড়াইল।

আবার বাধা আসিল। দরজার পথে প্রথমে ডেপুটি-কমিশনার ও আরও কয়েকজন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে দেখা গেল।

ইহারা একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া আসিতেছেন। লম্বা, সৌম্যদর্শন নিখুঁত সাহেবী-পোশাকে সজ্জিত, মুখে জ্বলন্ত পাইপ্।

বিস্মিত নীলার মুখ দিয়া দুটি অক্ষর বাহির হইয়া আসিল, 'বাবা!'

ডাক-সাইটে ব্যারিস্টার মহিম ব্যানার্জ্জিকে খাতির দেখাইবে না, এমন পুলিশ-অফিসার কমই আছে। ডেপুটি-কমিশনার তাঁহাকে নিজে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছেন।

'বেইল্ দেওয়া সম্ভব নয় কেন?' পাইপের ধোঁয়া ছাড়িয়া ব্যানার্জ্জি-সাহেব প্রশ্ন করিলেন।

'প্রিভেণ্টিভ্ ডিটেন্শন!' ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার চৌধুরি কহিলেন। 'মুলচেকা দিতে রাজি হলে বরঞ্চ ভেবে দেখা যেত। কিন্তু তাতে ইনি রাজি নন্...'

'চার্জ্জ কি?'

'বস্তির লোকজন নিয়ে শোভাযাত্রা বের করার উদ্যোগ। এতে শান্তিভঙ্গের গুরুতর আশঙ্কা রয়েচে।'

'আশঙ্কার কারণটা কি?'

'মাফ্ করবেন, মিঃ ব্যানার্জ্জি', চৌধুরি সবিনয়েই কহিলেন, 'পুলিশ কি কারণে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করচে, সেটা প্রকাশ করতে পুলিশ বাধ্য কি?...'

'না, তা নয়।' ব্যানার্জ্জি-সাহেব পাইপের ধোঁয়া ছাড়িলেন। 'সেটা পুলিশের ঘরোয়া ব্যাপার! তবে আইনজীবী হিসেবে আমার জ্ঞাতব্য এইটুকু, স্বাধীন ভারতের এক স্বাধীন নাগরিকের স্বাধীনতা-হরণের পক্ষে যথেষ্ট কারণ দেখা দিয়েছে কিনা।...কোন্ ধারায় আপনারা একে গ্রেপ্তার করেচেন?...'

'যদি তাই জানতে চান,' ডেপুটি-কমিশনার চৌধুরি এইবার একটু আক্রমণাত্মক সুরেই কহিলেন, 'তবে জানুন, ইণ্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল ল' অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্টের ১৬ ধারা অনুসারেই · '

'আমি বলছি, আপনি একে ছেড়ে দিন।' ব্যানার্জ্জি-সাহেব গম্ভীর-স্বরে কহিলেন।

'যদি উনি মুলচেকা দিতে রাজি হন, তবে বরঞ্চ আপনার খাতিরে...'

'আমাকে কোনও খাতির না দেখিয়েই বিনা মুলচেকায় ছেড়ে দিতে হবে।' ব্যানার্জ্জি-সাহেব তেমনি গম্ভীরভাবে কহিলেন।

'কারণ ?'

'কারণ', ব্যারিস্টার ব্যানার্জ্জি পাইপের ধোঁয়া ছাড়িয়া আইনজ্ঞের প্রত্যয়ের সঙ্গে কহিলেন, 'স্বাধীন ভারতের কোনও নাগরিককেই প্রমাণিত অপরাধ ছাড়া আটক রাখা চলবে না। এ রকম আটক অবৈধ আটক। এ স্বাধীন ভারতের কন্‌স্টিটিউশনের পার্ট থ্রি-র বিরোধী। যতদিন না কন্‌স্টিটিউশনের ধারার পরিবর্ত্তন হচ্ছে, ততদিন···'

'আমাকে আইন মেনে চলতে হবে', চৌধুরি কহিলেন। 'আমি দুঃখিত, মিঃ ব্যানার্জ্জি, আপনার বক্তব্য আমি মেনে নিতে পারলাম না···'

মহিম ব্যানার্জ্জি দুই তিন সেকেণ্ড নিঃশব্দে পাইপ টানিলেন। তারপর তপনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 'স্বাধীন ভারতের নাগরিক-অধিকারের প্রশ্ন আমি হাতে নিলুম, তপন। এখনও দেশে হাইকোর্ট আছে; সুবিচার আছে। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম রাষ্ট্র-বিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হয়েচে তার যদি কোনও মানে থাকে, তবে তোমাকে কেউ আটক রাখতে পারবে না। শুধুমাত্র মতামতের জন্য বা মত-প্রকাশের জন্য কাউকে নির্য্যাতন করা চলবে না।

হাইকোর্টের কাছ থেকে আমাদের দেশের মহা-আইনের এই ব্যাখ্যাটি এনে এদের শুনিয়ে যাব। ততদিন তোমাকে ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। আজ কিছুই করতে পারলুম না। কিন্তু প্রতিকার আসতে খুব দেরি হবে না।...চলুন, বৌদি!' সহসা ব্যানার্জ্জি রাণীদেবীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন। 'এসো, প্রতাপ। এবার আমরা যাই। এর কষ্টটা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। কালকেই বিষয়টা আমি হাইকোর্টে তুলছি।...কে জানে, হয়তো আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মোকদ্দমার সূত্রপাত হলো...' বলিয়া উমা ও নীলা দুই সখীকে দুই হাতে ধরিয়া তিনি দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন।

সতেরো

ইহার ঘণ্টাখানেক পরে পিতাপুত্রী বাড়ির দিকে চলিয়াছেন। মুখুজ্জেদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে হইয়াছে। পৌঁছাইয়া দিয়া তখনি চলিয়া আসা যায় নাই। রাণীদেবী অপ্রবোধ্য হইয়া উঠিয়াছেন। ব্যানার্জ্জি-সাহেবকে অনেক বুঝাইতে হইয়াছে।

থমথমে ভাবটা দূর করিবার জন্য ব্যানার্জ্জি-সাহেব চা ফরমাস করিয়াছেন, চাঞ্চল্যকর সব মোকদ্দমার গল্প উঠাইয়াছেন, হাসি-মস্করা করিয়াছেন। ইহাতেও যথেষ্ট উৎসাহের সৃষ্টি হয় নাই মনে করিয়া তবেই তাঁহাকে রিট্ অব্ হেবিয়াস্ কর্পাস্ এবং রিট্ অব্ ম্যাণ্ডেমাসের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। এই আইনবলে কি করিয়া বে-আইনীভাবে আটক লোককে কোর্টের সমক্ষে হাজির করিতে পুলিশকে বাধ্য করা যায়, এত বড় ব্যারিস্টারের মুখে তাহার খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা ও বিভিন্ন দৃষ্টান্ত শুনিবার পর রাণী কিছুটা আশ্বস্ত হইয়াছেন।

ইহাদের প্রবোধ দিবার জন্যও কিন্তু ব্যানার্জ্জি-সাহেব নিজের একটা দৃঢ় ধারণা সম্বন্ধে ইহাদের কাছে কোনও উচ্চবাচ্য করেন নাই। তাঁর বিশ্বাস এই যে, পুলিশের ডেপুটি-কমিশনার এইবার ভয় পাইয়া ব্যাপারটা অবিলম্বে উচ্চতন কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিবেন এবং তাঁহারা এমন অস্পষ্ট অনির্দ্দিষ্ট কারণে স্বাধীন ভারতের কোনও নাগরিকের স্বাধীনতা-হরণের সমর্থন করিবেন না। অবিলম্বেই তপন মুক্তি পাইবে। কিন্তু ইহা মাত্র আশার কথা। মন্দের জন্য প্রস্তুত থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

'নীলু?'

'কি বাবা।'

'যে লোক পরিচয়হীন', ব্যানার্জ্জি-সাহেব পাইপের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিলেন, 'তাকে আমি কখনও সম্মান করতে পারিনে। এই অ-সম্মানের আওতার মধ্যে আমাদের তপনও পড়ে গিয়েছিল। তপন বড়ো ভালো ছেলে, কিন্তু ওর কোনই পরিচয় ছিল না। এমন কি, একটা জন্ম-পরিচয়ও ছিল না। তাকে আমি কি করে' সম্মান করতে পারি বল্? এমন অখ্যাত লোকের হাতে কি কখনও আমার নীলু-মাকে আমি দিতে পারি?...'

গাড়ি বাড়ির দিকে ছুটিতেছে। পিতাপুত্রী পিছনের আসনে আসীন। রাত অনেকটা হইয়াছে। জয়ন্ত এখনও বসিয়া আছে কিনা, কে জানে। কিন্তু মহিম ব্যানার্জ্জি সে কথা ভাবিতেছেন না। তিনি অন্য কথা চিন্তা করিতেছেন।

'কিন্তু এখন আর সে পরিচয়হীন নয়।' সহসা ব্যানার্জ্জি-সাহেব দৃঢ়স্বরে কহিলেন। 'নিজের পরিচয় সে নিজেই অর্জ্জন করেচে। সে এত ক্ষমতাবান যে, পুলিশ পর্য্যন্ত তাকে ভয় করে! তাকে আর তাচ্ছিল্য করবার উপায় নেই। লক্ষ লোকের মধ্যে সে বিশেষ একজন! এইবার তার জন্য শুরু হবে ভারতবর্ষের নাগরিক-স্বাধীনতা সম্পর্কিত প্রথম মামলা। ভারতবর্ষের কারুরই আর তাকে জানতে বাকি থাকবে না।...কিন্তু আগে তো তাকে ছাড়িয়ে আনি।...আর তার জন্য যদি ভারতবর্ষের কনৃষ্টিটিউশনেরই পরিবর্ত্তন করতে হয়, সেও বড় কম সম্মানের কথা নয়...'

'হ্যাঁ, বাবা।' নীলা কহিল।

'বাবার ওপর খুব অভিমান হয়েছিল, না রে?'

'না তো।'

'তবে এসে বললি নে কেন, তপনকেই আমার বর করে' দাও, বাবা; এ তোমাকে দিতেই হবে।...দুষ্টু মেয়ে!...' বলিয়া ব্যানার্জ্জি-সাহেব মেয়ের মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিলেন। নীলা কিছুই বলিল না। দুই হাতে পিতাকে জড়াইয়া ধরিল। তার বাবার মতো এমন বাবা ক'জন পায়! এমন বাবারও কখনও অবাধ্য হওয়া চলে!

নীলা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।